শাক্যান্ন

হিরণ্ময় ঘোষালের অন্যান্য বই :

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় (প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি)

হাতের কাজ (গল্প-সমষ্টি)

শাকাম্ব

হিরণ্ময় ঘোষাল

অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্‌
পি-৯১, সর্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৪৯।

দাম : আঠারো আনা

পি-৯১, সর্দার শঙ্কর রোডে
অগ্রগতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে
আশু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিচয়-লিপি

যাঁরা বাঙ্গালী-যৌবনের কিয়দংশ বিলেতে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কাছে গল্পগুলি নেহাৎ নাঈফ্ বলে মনে হবে। তবে এই কাহিনী-কটি এবং তাদের চরিত্রাবলী সম্পূর্ণরূপে কল্পনা-প্রসূত বলেই বলতে সাহসী হচ্ছি যে, তাদের অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ধ্রুব। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশের ছেলেদের বিলেতে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। তবে দূর দেশে গিয়ে তারা যে শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় না, এইটেই নিতান্ত আফশোষের বিষয়। নিজেদের রুম্‌সে বসে তারা আপন-আপন মনে যে এঁদো এবং অস্বাস্থ্যকর চোর-কুঠুরী রচনা করে তারই দু-একটি চিত্র ছকে দেওয়া গেল।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৪৯

হিরণ্ময় ঘোষাল

ত্রিভুজ

তিনটি চরিত্রের একত্র সমাবেশ—হিতেন, সত্যপ্রসাদ ও অমল।

হিতেন লণ্ডনে থেকে পড়া-শুনো করে। বিশ্বসংসার তার কাছে কয়েকটি বিদেশী সাহিত্যে সীমাবদ্ধ, এবং তদনুসারে তার কেশ দীর্ঘ ও চক্ষুদ্বয় অস্ফুট-প্রতিভা-দীপ্ত। নির্বাপিত আগ্নেয়-গিরির মত তার ভেতরে সামান্য কিছু তেজ থাকলেও ভবিষ্যতে অগ্ন্যুদ্গারের কোনো আশঙ্কা নেই, কারণ সে আদর্শবাদী।

সত্যপ্রসাদ কেম্‌ব্রিজ-ফের্তা। কেম্‌ব্রিজে শিক্ষা শেষ করে তার দেহটা কোনমতে ইহজগতে ফিরে এসেছে। তবে তার আত্মা যষ্টি-হস্তে কেম্‌ব্রিজের বিচিত্রিত গলাবন্ধ ও গলরজ্জু-ভূষিত হয়ে ক্যাম্‌ স্রোতস্বিনী তীরে আজও হাহাকার করে ফেরে। তার ভাব-ভঙ্গী নিরতিশয় আত্মপ্রত্যয়-পরিপূর্ণ। জীবন সম্বন্ধে কোনপ্রকার অলীক স্বপ্ন পোষণ করা তার রুচি-বিরুদ্ধ।

অমলের কথা। স্রোতে-ভাসা তৃণের মত তার মন প্রবল গতিতে অনায়াসে দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করে চলে। পূর্বোক্ত উপমা থেকেই বোঝা যায়, তার নিজের মতামত বলে বিশেষ কিছু নেই, যদিও তার দৃঢ় ধারণা এই যে, তার ক্ষিপ্র-ভাসমান মনের প্রগতির জন্যে দায়ী সে একমাত্র নিজেই। মনস্তাত্ত্বিকদের সে অগ্রণী, এবং মনোবিজ্ঞানের এক চিৎপুরের গলিকে সম্প্রতি সে আবিষ্কার করেছে। জীবনের অনেক কদর্যতাই যে ব্যবহারোপযোগী, তা ভাবী ব্যবহারজীবী হিসেবে সর্বত্র প্রচার করা তার একটা মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং একথা সে কারো কাছেই গোপন করে না যে, ভারতবর্ষে সামান্য সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সে-দেশে সুরু হবে, গণ্ডায় গণ্ডায় বিবাহ-বিচ্ছেদ। তখন মনস্তাত্ত্বিক আইনজ্ঞদের পসার বেড়ে উঠবে উল্কার মত। "উল্কা" ও "স্ফুলিঙ্গ" এই দুটি কথা অমলের কথাবার্তায় যত্রতত্র উপমা-রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অথ কথারম্ভ :

হেমন্তের এক ধূম্রবর্ণ সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে লণ্ডনের ব্লুম্স্বেরী পল্লীর এক বোহেমীয় ধরণের বৈঠকখানায় বসে জীবনের আদিম ও অন্তিম তাৎপর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক গবেষণায় যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, তখন সত্যপ্রসাদ সেইদিনকার সমস্ত বিচারবিতর্ককে গোটাকয়েক পাইপ-ফুৎকারে জানলা পার করে দিয়ে তার কেম্ব্রিজের ফরাসী উচ্চারণে বললে—আর যাই বলো ভায়া, জীবনের জিষ্ট্ হচ্ছে শেয়ার্শে ল্যা ফাঁম্।

অমল সায় দিয়ে বলে উঠলো—ব্রাভো, এই তো চাই! কথাটা যা বললে, একেবারে স্ফুলিঙ্গ! বলো তো ভাই! আমি দিন-রাত্তির এই কথাই তো বলি হিতেনকে। আর কিছুদিন এইভাবে কাটালে ও একটা শক্ত অসুখে পড়বে, এ তোমায় বলে দিচ্ছি সত্যপ্রসাদ। জানো তো ভাই, ইন্‌হিবিশন্ কী চীজ্!

খানিকটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে সত্যপ্রসাদ বললে—জানি না আবার! বেঁচে থাক্ আমাদের কেম্‌ব্রিজের মেড্‌স্ আফ্‌টার্‌নূন্ আউট্! বলি ভায়া হিতেন্দ্রনাথ, আর কতদিন কাটাবে এমন করে? তোমার ঐ ব্রহ্মতেজের চোটে রাস্তা-ঘাটের উমা-উমীরা যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, তাও কি তোমার নজরে পড়ে না হে? কোন্‌দিন একটা কেলেঙ্কারী ঘটাবে দেখতে পাচ্ছি! প্রেম-ট্রেমের কথা ভুলে যাও ভাই। এ বয়েসটা আমাদের চরিত্র-গঠনের বয়েস। এখনো যদি জীবনটা একটু বাজিয়ে দেখে না নিলে তো পরে এমনি ঠকানটা ঠকবে যে, সারা জীবন একটি মেকী দোয়ানীকে সম্বল করে কাটাতে হবে ভাই।

অমল বাহবা দিয়ে উঠলো—ডাস্ কাপিটাল্! একেবারে ছাঁকা ফিলসফি, উক্কা! হেঁ হেঁ, নকল না চিনলে আসল চেনা যায় না। ঠিক বলেছ ভাই, একেবারে খাঁটি আরবী-ইরাণী মুক্তো-ব্যবসায়ীদের ভাষা। শুনছো হিতেন?

সত্যপ্রসাদ হিতেনকে চোখ ঠেরে বললে—যাবে নাকি আজ? একবার পরখ করেই দেখ না, তুমি তো আর সীতে-সাবিত্তির নও হে, যে এক কথাতেই সতীত্ব হারাবে! এটা মনে রেখো,

হিতেন, আমরা পুরুষমানুষ, এবং ওটা আমাদের বার্থ্-রাইট্! চলো হে, আজই তোমার বউনী করিয়ে দি। কী বলো অমল?

উত্তেজনায় অমলের জিন-বিনিন্দিত দুটো কান পুঁইমেটুলীর মত বেগুনী হয়ে উঠেছে। একটু ইতস্ততঃ করে বললে—ভু-হুঁ-ভু, হ্যাঁ, বউনী যদি করতেই হয় তো অবশ্য শুভস্য শীঘ্রং! মানে, লাভ্-টাভ্ সেন্টিমেণ্ট-টেন্টিমেণ্ট্ যা বলো, ওসব বম্বেতেই রেখে আসা গেছে। ওসব আমাদের দেশের ঠুন্কো জিনিষ; জগতে যখন বেরিয়ে পড়া গেছে তখন আমাদের নিজেদেরও জগতের মানুষ বলেই জ্ঞান করা উচিৎ। তা ছাড়া আমাদের জেনারেশন্টা তো একটা প্রকাণ্ড ট্র্যান্জিশনের জেনারেশন্! লাইফের ভেতর দিয়ে আমাদের যেভাবে চলতে হচ্ছে তা অগ্নিপরীক্ষার চেয়েও কঠোর। যাকে বলে গিয়ে তোমার স্ফুলিঙ্গ! একে পরীক্ষা-পাসের গুঁতোতেই অস্থির, তার ওপর আবার যদি নিজের প্রাইভেট্ লাইফের ছোটখাটো প্রব্লেম-গুলোকেও ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস্ দিয়ে দেখতে আরম্ভ করি তো অচিরেই বেড্ল্যামে ঢুকতে হবে। তা হিতেন তুমি ভাই যা ভালো বোঝো করো। তোমাকে আমরা ফোর্স্ করতে চাই না। শুধু পুরোনো বন্ধু হিসেবে প্রোপোজ্ করছি মাত্র।

রোমান্টিক হিতেনের মনে তখন বসন্তের বাতাস বইতে সুরু করেছে। ইস্কুলে পড়বার সময়ে জনৈক সহপাঠীর বোনকে দেখা-মাত্রই সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। বীজগণিতের খাতায় কবিতা লেখা, ঈপ্সিত ব্যক্তির ইস্কুলের বাসের পিছু-পিছু সাইকেল

ছুটোনো এবং আমাদের দেশের আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের যে-যে লক্ষণ সাধারণতঃ গল্প-লেখকদের চোখে পড়ে, তার একটাও তৎকালীন হিতেনের কার্যাবলী থেকে বাদ যায়নি।

ইস্কুলের পড়া শেষ করে হিতেন কলেজে ঢুকলো, এবং ডিগ্রী নিয়ে বিলাত গেল। তার কিশোর বয়েসের প্রেম তার মনের আওতায় অল্পে অল্পে বেড়ে আজ ফলফুলে হয়ে উঠেছে। তাকে অভিজ্ঞতার সূর্যতাপ বা বিচ্ছেদের চন্দ্রালোক আজও স্পর্শ করতে পারে নি। তা যেন দক্ষিণ আমেরিকার কোন্ এক নাম-না-জানা অর্কিদ্, বনের গহন অন্ধকারে তার জন্ম, এবং সেই অন্ধকারের বুক-চেরা শুধু একটি লাল ফুল, কালো দেহে টাট্‌কা ক্ষতচিহ্নের মত। ইত্যাদি ইত্যাদি। হিতেনের নিজের ঢঙের ভাষা ব্যবহার করে তার মনে পীড়া দিতে চাই না।

যাই হোক, ইতিমধ্যে হিতেনের প্রেম-পাত্রীটির কয়েক বছর আগেই এক প্রৌঢ়, পুত্রকন্যাবান্, বিপত্নীক অধ্যাপকের সঙ্গে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবং উক্ত দয়িতার নিজেরও গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে তার আঁচল ধরে গুড়-মাখা হাত চেটে "মা-মা" রবে বাড়ী মাথায় করছে। হিতেন নাকি এ-সম্বন্ধে একখানা উপন্যাসের আধখানা লিখে ফেলেছে, যার সার মর্ম এই: প্রেম অপার্থিব, বস্তু তার ছায়া মাত্র। আসল কথা, ভালোবাসার বাসাটা হচ্ছে প্রেমিকের মনে। বাইরের ঝড়-বাতাসে যখন হোমরাই-চোমরাই বনস্পতিগুলো পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তখন প্রেমের বাসাটায় সদ্য-প্রসূত ডিমগুলোয় তা'

দেওয়ার কাজ আফিমের নেশার মত আরামে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর সঙ্গে স্নোকাই, গ্যোলেরুপ প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকদের মতামতের কোথায় কী যোগ তা কৃষ্টিবান্ পাঠকমাত্রেই জানেন।

আপাততঃ সত্যপ্রসাদের প্রস্তাবে হিতেনের মনের নিভৃত অর্কিদ-গাছের পাতাগুলো বসন্তের বাতাসে সির্-সির্ করে কাঁপতে লাগলো, এবং গহন বনভূমির দুর্ভেদ্য পত্রপল্লবের প্রচ্ছদ ভেদ করে তাকে সেদিন প্রথম অভিজ্ঞতার সূর্যতাপ স্পর্শ করলে, যদিচ, স্মরণ রাখতে হবে, তখন হেমন্তকাল চলেছে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালেই টিপ-টিপিনি বৃষ্টিতে সুদীর্ঘ বাদল-রাত্রির সূচনা করছে।

তিন বন্ধুতে হাল-ফ্যাসানের রেন্-কোটের বিজ্ঞাপনের কায়দায় বর্ষাতিতে কান ঢেকে মার্কিনী ডাকাতের মত মাথার একদিকে তেরচা করে টুপি বসিয়ে লন্দনের বৃন্দাবন, মার্বল্ আর্চ-এর মোড়ে দোতলা বাস্ থেকে নামলো।

অমল ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত অপ্রত্যাশিতভাবে তার কোল-কুঁজো পিঠটাকে খাড়া সোজা করে বললে—হিতেন, কুরাঝ্ কুরাঝ্, অমন বিচলিত হলে চলবে না, এতদিন আমরা যে-লাইফ লীড্ করে এসেছি, সেটা শুধু লাইফের গৌরচন্দ্রিকা।—তারপর মার্বল্ আর্চ-এর মর্মর-নির্মিত তোরণের তলা দিয়ে যাবার সময় যোগ করলে—এইবার আমরা সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ জীবনে প্রবেশ করলাম। কী বলো হে সত্যপ্রসাদ?

সত্যপ্রসাদ এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শিস্ দিয়ে Under the

Marble Arch-শীর্ষক একখানা রেকর্ডী গানের সুর ভাঁজছিল। অমলের দিকে না তাকিয়েই কতকটা স্বগতঃ উত্তর দিলে— তোমরা এখনো লণ্ডনের কিছুই চেননি। মার্বল্ আর্চ-এ যে ডিসেণ্ট্ জিনিষ পাওয়া যায় না, তা আমরা কেম্‌ব্রিজে থেকেও জানি। এদিকের এগুলো টেরিব্লি ম্যান্-হ্যাণ্ড্‌ল্‌ড্। তাদের খপ্পরে একবার পড়লে বেরিয়ে আসা তোমাদের সাধ্য নয়। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্ গার্ল্‌স্ কি এদিকে আসে? সার্পেন্‌টাইন্-এর ওপারে না গেলে তাদের দেখা মিলবে না।

হাইড্ পার্কের বুক-চেরা এই সর্পিল পরিখাটি অতিক্রম করে তারা একটা প্রকাণ্ড লাইম্-গাছের তলায় বেঞ্চের ওপর এসে বসলো। হিতেন, সত্যপ্রসাদ আর অমল। ফগের সঙ্গে মেশা গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা তাদের টুপি আর রেন্-কোটের ওপর নানান্ রকমের এলোমেলো নক্সা কাটতে লাগলো। তিন বন্ধু পাইপে অগ্নি সংযোগ করে, ধারে-কাছের পায়ের শব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে, আজকের এই হেমন্তের বাদল-সন্ধ্যার পরিণতি সম্বন্ধে আপন-আপন লিপ্সিত কল্পলোকে নিজেদের আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেললে।

হিতেন ভাবছে, আজ যার সঙ্গে দেখা হবে, সেই-কি তার জীবনের প্রথম কায়াময়ী নারী? কৈশোরে যে মানসী কবিতার প্রেরণার আবরণ ভেদ করে ক্ষণে ক্ষণে তার নব-উদ্বুদ্ধ

চেতনাকে স্পর্শ করতো, প্রথম যৌবনে যে তার চোখের সম্মুখে একদিন জীবনের এক অপূর্ব বিস্ময়-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিল, সেই মানস-সুন্দরীর সঙ্গে আজিকার এই হেমন্ত সন্ধ্যার অপেক্ষিতার সাদৃশ্য কোথায় ? তার মনে পড়লো, বহুদিন আগে বাংলা মাসিকের পাতায় একটি বিজ্ঞাপনের ছবির মুখ। তাকে ঠিক ছবি বলা যায় না, শুধু কয়েকটা রেখার টান। কিন্তু তাতেই যে ঢলঢলে মুখখানিতে যৌবনের পরিপূর্তি ও প্রতি অঙ্গের নারী-সুলভ নিষ্ক্রিয় লিপ্সা ফুটে উঠেছিল, সেও তো নমিতা ছিল না, ছিল তার কামনা-রাজ্যের অনূঢ়া বারাঙ্গণা। আজ যে আসবে সে যদি তার রক্ত-মাংসের অস্তিত্বকে অবলীলায় বিজ্ঞাপনের ছবির মতই তার ভোগ-লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাতে তার গ্লানি বোধ হবার কোনো কারণ নেই। হিতেনের মন এবার সত্যিই তার আজন্ম সংস্কার, সংশয় ও সম্বিহার বন্ধন ছিন্ন করলে। যে আসবে তাকে নিতান্ত সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ করবার জন্যে সে মনে মনে প্রস্তুত হলো। সে বসে বসে ভাবতে লাগলো, ঐ সে এলো বুঝি ; অন্ধকারের অতল তল থেকে পায়ে চলার শব্দে নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করে তার সামনে এসে দাঁড়ায় বিদেশিনী নাগরী। চপল চোখের ইশারায় বলে, Will we go ? হিতেন স্বপ্নাবিষ্টের মত তার অনুসরণ করে। খানিকদূর গিয়ে সে হিতেনের দ্বিধাজড় হাত-খানাকে আপন হাতে টেনে নেয়, তার পাঁচ আঙুলের সঙ্গে আপন পাঁচটা আঙুল বুনে জিজ্ঞেস করে—Why are you so

shy? তারপর নিজেই প্রস্তাব করে—Let's go to Soho, will we? হিতেন তার সঙ্গে হাতে হাত রেখে হাইড্ পার্কের বড় বড় নিষ্পত্র গাছগুলোর তলায় আধো-অন্ধকার পথ দিয়ে চলে। সহসা হিতেনের গলায় তার হাতদুখানা জড়িয়ে দিয়ে সে ওর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে শুধায়—You aren't sorry, are you, sweet? তারপর তারা বাসে চড়ে সোহোয় এসে ঠিক সেই ইতালীয় রেস্তোরাঁতে ঢোকে যেখানে হিতেন প্রায়ই এসে বসে দান্তে, পেত্রার্কা, দেলেদ্দা বা পিরান্দেল্লোকে সঙ্গে নিয়ে। হিতেন ক্রমে আপন অভ্যস্ত আবহের মধ্যে এসে পড়ে। পরিচারককে সংক্ষেপে হুকুম করে—Uno mezzo bianco। আজ যেরকম ভিজে স্যাঁৎসেঁতে দিন করেছে, তাতে লালের চেয়ে শাদাটাই ভালো—It's a little dry, at any rate, পেয় সম্বন্ধে হিতেনের সহাচারিণী আপন মত ব্যক্ত করে। সবিস্ময়ে হিতেন আবিষ্কার করে, সে ফরাসী ও ইতালীয় অনর্গল বলতে পারে, সাহিত্যেও তার অধিকার কম নয়। বেআত্রিচের রূপ বর্ণনা-বিষয়ক দান্তের কথা আবৃত্তি করে হিতেন বললে—

Ciascuna stella negli occhi mi piove

সে পাদপূরণ করে দিলে—

Della sua luce, della sua virtute.

সুন্দর তার উচ্চারণ, কথাগুলো আবৃত্তি করবার সময় তার সাবলীল জিভখানি মুক্তোর মত দাঁতগুলোকে লঘু ও ক্ষিপ্র গতিতে স্পর্শ করে গেল,

যেন "নাক্র্"-খচিত লীর-যন্ত্রের ওপর নিপুণ আঙুলের মৃদুল ঝঙ্কার। তারপর চলে সাহিত্য আলোচনা। পেত্রার্কার কাব্যের বীজ কীভাবে রঁসারে বিকাশ লাভ করে, পরবর্তী ফরাসী কাব্য-সাহিত্যকে ফলে-ফুলে ভরে তুললে, এ-আলোচনাতেও সে হিতেনের সঙ্গে অতি সহজভাবে যোগদান করলে। তারপর যখন রেস্তোরাঁ বন্ধ করবার সময় হলো, তখন তারা পথে বেরিয়ে চললো ব্লুম্স্‌বেরীর দিকে। হুহু করে বৃষ্টি নেমেছে। হালকা কুয়াশায় ঢাকা লণ্ডন সহরটাকে বাস্তব বলে মনে হয় না। হিতেনের রেন্-কোটটা দুজনে ভাগাভাগি করে মুড়ী দিয়ে তারা চলেছে। হিতেন পোল্ ভের্লেন্ আবৃত্তি করে—

Il pleure dans mon coeur

সে পূরণ করে দেয়—

Comme il pleut sur la ville.

হিতেন ভাবে, যাকে সে আপন বাসনার সহচরীরূপে পেতে চায়, সে যে বহুরূপীর মত রাত্রে দয়িতা ও প্রভাতে নমিতার মূর্তি ধারণ করবে, এর চেয়ে বড় আত্মপ্রবঞ্চনা জগতে নেই। তার সঙ্গে যদি শরীর ও মনের কামারাদরী না পাওয়া গেল, তো সে কামনার তাৎপর্য ঘটনা-চক্রে বংশরক্ষার মতই দুর্নৈতিক। ব্লুম্স্‌বেরীর গরীব পাড়ায় রাস্তার দিকের তার বোহেমীয় ধরণের ঘরখানায় এসে তারা ঢুকলো। সে-বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক নেই। গ্যাসের আলোটা জ্বালতে আর প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে আগুন জ্বেলে সে তার সঙ্গিনীর গা থেকে

ভিজে জ্যাকেট্‌টা খুলে নিয়ে আগুনের ধারে ছোট্ট কাঠের পর্দাটার ওপর মেলে দেয়। তারপর তারা দুজনে মুখোমুখি আগুনের কাছে বসে। হিতেন প্রস্তাব করে—

Shall we brew some tea ?

What a topping idea ? Do let's, will we ?

গ্যাস্‌-রিঙের ওপর কেৎলীটা চড়াতে চড়াতে হিতেন দেখে, সে তন্ময় হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে আছে, তার মুখের ওপর পড়েছে আগুনের লাল আভা, কপালের ওপর ঝুমকো ঝুমকো সোণার বরণ চুল। হিতেনের মনে পড়ে ছেলেবেলাকার Cinderella, যার কাহিনী সেই অল্প বয়েসেই তার বুকে একদিন কামনার আগুন জ্বালাতো। হিতেনের মন সেই বাদল-রাত্রির কাম-ক্রীড়ার প্রতিটি উপকরণ, প্রতিটি ঘটনা কল্পনার পটভূমিতে আস্তে আস্তে এঁকে চলে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে সত্যপ্রসাদ ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে, সওয়া সাতটা। এদিককার কাজকর্ম সেরে নটার শো'টায় যাওয়া হয়ে উঠবে কি না, সেই চিন্তাটাই বারে বারে তার মনকে শার্শীর ওপর আঙুল ঘসার মত করে পীড়া দিচ্ছে। আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখবার জন্যে সে মুহুর্মুহু পাইপে অগ্নিসংযোগ করে মনে মনে হিসেব করছে—Five bob for this, a shilling for the other thing, half-a-

crown for the show, that makes eight and six in all. I'll have only one and six left. Well, to-morrow's Sunday, you get your dinner and supper from the landlady-Then on Monday to Cook's. Papa sends his cheque for thirty quid, and that finds me a quid pro quo for this muck of a life in London. নিজের বাক্য-বিন্যাসের চাতুর্যে সে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উত্তেজিত দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তার হাসি পায়, মনে মনে বলে—Nanny's darlings. Why the hell, can't they grow up? Sentimental idiots, they've yet to learn quite a deal from life. Amor non est, my sweeties, amor non est.

অমলের চিন্তাস্রোতও হিতেনের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় বহে চলে। তার সুমুখে যে-মেয়েটি এসে দাঁড়ায়, তার অফুরন্ত রূপ আর অটুট স্বাস্থ্য। এক কথায় যাকে বলা যায়, তার ভাষায়, ইন্‌হিবিশন্‌-মর্দিনী। এক দিকে যেমন সে বত্তিচেল্লী, আঙ্গেলো, বা ভীঞ্চির চিত্র-নায়িকা-সমূহের প্ররিস্রুত সার বস্তু, অপর দিকে সে মার্কিনী Musical Comedy-র কোরাস্‌ গার্ল্‌স্‌-এর মত চপলা, প্যারীস Follies bergères-এর অপ্সরীদের মত চটুলা, এবং চিত্রকর হল্‌বাইন্‌ পরিকল্পিত ডম্বেল্‌-মুগুর-ভাঁজা জার্মান রূপসীদের মত নিটোলা। তার পূরন্ত গালে টোল, তার ভরন্ত

হাতের কনুইএ টোল। অমলের নিজের চেহারা রোগা-ছিপছিপে হলেও এবং তার নিজের গণ্ডস্থল মাংসবিরল হলেও এই যে পরিপুষ্ট ললনাটির রূপ বর্ণনা করা গেল, এ তার মানসী-মূর্তির ছবি। তার নিকট বন্ধু ও পরিচিতেরা সবাই জানেন, চিত্রকর গোগ্যাঁর মত একটু ভরাট্‌ মেয়েদের প্রতিই তার আসক্তি বেশী। সুতরাং সর্পিল সার্পেণ্টাইনের তীরে ফগ আর গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মায়াজালের ভেতর রেন্‌-কোট মুড়ি দিয়ে বসে সে তার ইন্‌হিবিশন্‌-নিবারণের জন্যে যে নিষিদ্ধার মূর্তি মনে মনে আঁকতে বসলো, তার সঙ্গে যে ওপরের বিবরণের হুবহু মিল আছে, একথা অমলের বন্ধু বা পরিচিত মাত্রেই স্বীকার করবেন। অমলের সামনে এসে দাঁড়াতেই, সে খুব একটা ফরোয়ার্ড্‌ অ্যাটিটিউড নিয়ে নিজেই প্রস্তাব করলে—Shall we go? উত্তর যেমন আসা উচিৎ তেমনিই এলো—Yes, will we? তবে তার কথা বলার এমন একটা চঞ্চল, চপল, চটুল ভঙ্গী আছে, যা তার কল্‌জের স্ফুলিঙ্গকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়, এবং যা উল্কার মত অমলের বুকে এসে লাগলো, যে সে হাইড্‌পার্কে বা "ব্রাম্ভোরিয়া-"তে বৃথা কাল-বিলম্ব না করে মাটির নীচে বিদ্যুৎ-যানে চড়ে আপন নিষিদ্ধাকে বগলদাবা করে উল্কার মতই ছুটলো ক্ল্যাপ্যাম্‌ সাউথে আপনার রুম্‌স্‌-মুখো। তার বাড়ীর রাস্তায় এসে তার উল্কা-গতি শামুকের গতিতে পরিণত হলো, কারণ তার নিজের মন খুব ফরোয়ার্ড্‌ হলেও তার ল্যাণ্ড্‌লেডীর মন সংস্কারের তমসা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এবং এই বর্ষীয়সী মহিলার

মনে যীশুপ্রেম ব্যতীত অন্য কোনো ঐহিক প্রেম বা অনুভূতি যে কখনো প্রবেশ-লাভের সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি, তা তার আকারের পরিধি ও ব্যাস এবং নাকের ওপর ষ্ট্রবেরীর মত একটা আবের অস্তিত্ব থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। সুতরাং যে-ব্যক্তি সারা জীবন ভগবত্ত-বাসরে অতিবাহিত করে এসেছে, এবং যার বাড়ীর প্রতি ঘরে ভাড়াটেদের নিদ্রার উদ্রেকের জন্যে বিছানার পাশের টেবিলের ওপর একখানি করে বাইবেল রাখা আছে, সে যে হাসিমুখে অমলের এই গান্ধর্ব্য বাসরে অনুমতি দেবে, এরকম আশা করা দুরাশা মাত্র। কলিযুগের এই মারীয়া মাগ্‌দলনাকে অমল মনে মনে উপহাস করলেও তাকে সে দস্তুরমত ভয় করে চলতো, কারণ পাঁচ মিনিটের নোটিস্ দিয়ে ভাড়াটের ক্যাবিন-ট্রাঙ্ক, সুটকেস্, টুপি, ছাতা, ছড়ি প্রভৃতি ফুট-পাথের ওপর হাজির করেছে, এ-দৃশ্য অমল স্বচক্ষে দেখেছে। এবং এই বৃদ্ধার বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে অমলের একদণ্ড চলবে না। ঘড়ি ধরে যথেচ্ছ-পরিমাণে আহার্য এবং ঘুমতে যাবার আগে স্যানাটোজেন বা হর্লিক্‌সের সঙ্গে আপেল, নেস্‌পাতি, এবং প্রতিবার ভোজনান্তে ফস্‌ফারিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, এত সুখ-সুবিধা লণ্ডনের কোনো ল্যাণ্ড্‌লেডীর বাড়ীতে পাওয়া যাবে কিনা, সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। তাছাড়া সাপারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে বৃদ্ধার ইংরেজ পরিচিতাদের সামনে বেদ-উপনিষদের মাহাত্ম্য ও ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে চরিত্রবান্

ব্যক্তি বলে যে রেপুটেশন্ অর্জন করেছে, তার অবস্থাটা কী হবে, সেটাও বিশেষ চিন্তিতব্য। কারণ তার ব্রহ্মচর্য-গুণ-মুগ্ধ অবিবাহিতা বৃদ্ধাদের কাছে তার সপ্তাহে দুটো-তিনটে চা বা সাপারের নিমন্ত্রণ একেবারে ধরা-বাঁধা। এবং একথা অমল উত্তমরূপেই জানতো যে, এই অবিবাহিতা মাগ্‌দলনাবৃন্দ মারীয়ার অপৌরুষেয় গর্ভধারণ ও খ্রীষ্টের ব্রহ্মচর্যে এমন অটল ও কঠোর বিশ্বাস পোষণ করেন, যে তাঁরা উক্ত আদর্শের তিলমাত্র উল্লঙ্ঘন মহাপাতক জ্ঞান করে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক এক নিমেষে বন্ধ করে দেবেন। এতে অমলের ক্ষতি এইদিক দিয়ে যে, সে যে ইংরেজ সমাজে অবাধে বিচরণ করে, একথা আর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করতে পারবে না। অমলের মন যখন তার কল্পিত নিষিদ্ধাকে নিয়ে বিব্রতভাবে আপন ঘরে প্রবেশ-লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ীর আনাচে-কানাচে বৃথাই ঘুরে মরছে, ঠিক সেই সময়ে দূরে ভিজে পাতা মাড়িয়ে চলা পায়ের শব্দ তিন বন্ধুকে সজাগ করে তুললে।

সত্যপ্রসাদ মুখ থেকে পাইপ না নামিয়েই বললে—ল্যা ভোয়াল্যা!

অমল সোজা হয়ে উঠে বসে বললে—পুলিস্‌ম্যান্ নয়তো?

সত্যপ্রসাদ অমলের অর্বাচীনত্বে হেসে উঠলো—তুমি প্সাইকলজি পড়চো না ছাত্তী! না জানো তো শিখে রাখো,

পুরুষের পায়ের চলন লম্বা টানা-টানা, আর মেয়েদের ছোট ছোট আর তাড়াতাড়ি।

অমল একটু অপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলে—Oh yes, yes, such a simple thing, এসব আমরা ছেলেবেলায় 'Boy's Scout-এ থাকবার সময়েই শিখেছি, বুঝলে হিতেন, মানে এই লাইফে কিছু কম করা হয়নি! এসব পোড়খাওয়া স্ফুলিঙ্গ-মার্কা ছেলে!

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে শুনে সত্যপ্রসাদ অমলকে ইশারায় থামতে বললে, এবং পরে শব্দ লক্ষ্য করে ডাকলে—কু-কু! হ্যালো, কু-কু!

উত্তর আসতে দেরী হলো না—কু-কু!

অমল উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালো, যেন সত্যপ্রসাদ এক নিমেষে শিকার পাকড়ে তারই হাতে তৎক্ষণাৎ অর্পণ করবে। সত্যপ্রসাদ একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ডাকলে—কু-কু, হ্যালো, Where are you?

উত্তর এলো—Allo, heer, kan you heer me? Haff you found hairr?

সত্যপ্রসাদ—Whom?

কণ্ঠস্বর—My toghter. A leettle child of taehn. I lost hairr about an hour ago, in ziss park.

সত্যপ্রসাদ দুই বন্ধুর দিকে চোখ টিপে বললে—Oh yes. Well, come nearer, here under this tree.

হিতেন বললে—বিদেশী, বেচারীর মেয়ে হারিয়েছে।

সত্যপ্রসাদ হিতেনের অনুমান হেসে উড়িয়ে দিলে—হ্যাঃ! তুমিও যেমন হিতেন্দ্রনাথ, don't be so naif, ওরকম একটা ছুতো না করলে পুলিশে এক্ষুনি টুঁটিটি টিপে ধরবে, সেদিকে খেয়াল আচে?

অমল সহাস্য প্রতিধ্বনি করলে—Galsworthy-র Escape-টাও পড়োনি হিতেন?

বন্ধুদের কথোপকথন লক্ষ্য করে দু-এক মিনিটের মধ্যেই তাদের সামনে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত এসে দাঁড়ালো হেমন্ত-সন্ধ্যার অপেক্ষিতা। সত্যপ্রসাদ ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ করবার জন্যে একটু এগিয়ে গেল, বললে—Good evening. How are you? A bit chilly, isn't it?

Okh yes, eet ees kalt, b-r-r-r-r-r, ferry kalt! Haff you sin my toghter, a leettle garl of tsehn yar? Ikh habe, I haff lost hairr in ziss park. Und jetzt, and now I kann nicht find hairr.

Is that so? Well, I'm sorry to hear that, very sorry indeed! Now, how about a walk?

A wak, yees, if you sink, ve kann find hairr.

হিতেন উঠে এসে জার্মান ভাষায় সমাগতাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলে, ঘণ্টাখানেক আগে সে তার দশ বছরের মেয়েটিকে হাইড্ পার্কে হারিয়েছে, এবং একঘণ্টা ধরে সে তার মেয়ের খোঁজে সমস্ত পার্কটাকে চষে ফেলেছে। তার বাড়ী

জার্মানীতে, ফ্রাঙ্ক্ফুর্তে, অল্পদিন হলো সে ইংলণ্ডে এসেচে, লণ্ডনের পথ-ঘাট তার কিছুই জানা নেই। হিতেন নিজেই তাকে মেয়ের খোঁজে থানায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে।

Okh, sank you ferry, ferry moch, shall ve go?

Oh yes, do let's, will we?—হিতেন বেশ একটু আড়ম্বর করে উত্তর দিলে। এবং নব-পরিচিতার সঙ্গে সে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

অমল অধীরভাবে সত্যপ্রসাদকে বললে—তুমি যাই বলো ভাই, ও আজ আমাদেরও হার মানালে। দেখেই বোঝা যায়, এসব কাজে ওর পাকা হাত, শুধু মুখে ভণ্ডামী করে।

পাকা হাত না, my eye! ওর মত অভদ্র আমি দুনিয়ায় দেখিনি! জানিস্ না হয় বাপু দু'চারটে ভাষা, তা অমন demonstrate করবার কী দরকার! আমরা যে-ভাষা বুঝি না, সে-ভাষায় কথা কয়ে বাহাদুরী দেখানো হলো! কিন্তু বাছাধন বোঝেন না, এদিককার মেয়েরা ও তোমার ফ্রেঞ্চ, জার্মান কলের জলের মত তর্-তর্ করে ঝাড়তে পারে। ওর মুখ দেখা উচিৎ নয়। নেহাৎ পুরোনো বন্ধু তাই, তা না হলে—

বেচারীকে সাবধান করে দেওয়া উচিৎ।

দিতে হয়, তুমি দাও, আমি ন'টার শো'তে চললুম।—সত্যপ্রসাদ কানের ওপর রেন্-কোটের কলার তুলে দিয়ে শিস্ দিয়ে Under the Marble Arch-এর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সার্পেন্টাইন্ পার হয়ে গেল।

হিতেন তার সঙ্গিনীকে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের তলায় এসে পৌঁছল। এই প্রথম তার অপেক্ষিতার মূর্তি তার নজরে পড়লো। প্রকাণ্ড তার চেহারা, বয়েস পঞ্চাশের নীচে নয়, থুৎনীর নীচে দাড়ী, নাকের নীচে গোঁফ, হৃষ্টপুষ্ট জার্মানী ইহুদিনী। তার জীবনের এই প্রথম অভিসার যে আজকের এই হেমন্ত-সন্ধ্যায় এমন নিষ্ঠুর পরিহাসে পরিণত হবে, একথা উপলব্ধি করে তার ভাগ্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে নিজেই মনে মনে খুব খানিকটা হাসলে। ঠিক এই সময়ে সে পেছন থেকে শুনতে পেলে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় অমলের গলার স্বর :

হিতেন, বন্ধু হিসেবে তোমায় সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, এদিককার মেয়েরা ঝুনো, একেবারে স্ফুলিঙ্গ। বিদেশী ভাষা বলবার মোহে নিজেকে ভুলো না ভাই। খুব সাবধান। সিগারেট দিলে নিও না। শুনচো? তাড়াতাড়ি ফিরো, শুনচো?

হিতেন ল্যাম্প-পোষ্টের কড়া আলোয় আর একবার তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হলো। অমলের কথার জবাবে স্বধু একটা "হ্যাঁ, ধন্যবাদ" বলবারও তার প্রবৃত্তি হলো না।

কলিকাতা,
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

পুতুল-নাচ

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বাংলাদেশে যেমন আকুল করে বর্ষা নামে, সে-বছর তেমনি জুলাইয়ের মাঝামাঝি অসহ্য গরমের পর হঠাৎ এসেক্স্ অঞ্চলে আকাশ-ভাঙা বাদল সুরু হলো। অমরেশ রায়ের পয়সার অভাব ছিল না, নেপালের তরাইয়ে তাদের প্রকাণ্ড জমিদারী, এবং একমাত্র সে নিজে ছাড়া তাদের বিশাল জায়গীরের ভোগ-দখল করবার মত আর কেউ ছিল না। সুতরাং কলকাতার বাড়ী তুলে দিয়ে সে এসেছে ছোট একখানি বাংলো কিনে ইংলণ্ডেই বসবাস ও শিল্প-চর্চা করে। এপিং-ফরেষ্টের কাছে ঢালু জমীর ওপর বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়ীটি। লণ্ডনের ক্ষিপ্র জীবন ও তরাইয়ের নির্জনতা, দুই-ই একেবারে হাতের নাগালে পাওয়া যায়।

লন্ডনের চেল্‌সী-ব্লুম্‌স্‌বেরী এবং পারীর বুল্‌ভার্‌ দেভি-তালিয়াঁর রেস্তোরাঁ-বাসী আঁকিয়ে, বাজিয়ে ও লিখিয়েদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখবার পক্ষেও এ জায়গাটায় সব দিক দিয়ে সুবিধা। কারণ অমরেশের বাংলো-বাটিকায় উইক্‌-এণ্ড্‌ করে যান্‌নি, এমন চিত্র, সুর বা কথা-শিল্পী ইঙ্গল্যান ও ফ্রাঁসস্থানে খুব অল্পই আছে। তা যদি আপনারা পরখ করতে চান্‌ তো বেশী দূর যেতে হবে না, অমরেশের ভিজিটার্স্‌ অ্যাল্‌বাম্‌ দেখলেই বুঝতে পারবেন। অমরেশ রায় লোকটা কে, এবং সে যে শুধু লিঙ্কন্‌স্‌ ইনে নাম-লেখানো সাধারণ ভারতীয় আইনের ছাত্র নয়, এই কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই উপরের অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হলো। এখন, সে-বছর এসেক্স-এর বর্ষার সঙ্গে অমরেশের কী সম্পর্ক, সেইটেই এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য।

এক নাগাড়ে এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি পড়া এমন কি ইংলণ্ডেও গরমকালে আকছার ঘটে না। এবং দ্বিতীয় দিনেই অমরেশের সর্দী হয়ে একটু গা গরম হলো। ঝিকে অ্যাস্‌পিরিন্‌ ও গরম লেবুর জল দিতে বলে, সেই যে সন্ধ্যার দিকে সে শয্যা নিলে, তারপর পাঁচ দিন সে বিছানাতেই প্রাতরাশ, মাধ্যাহ্নিক ও সান্ধ্য ভোজন গ্রহণ করলে। অমরেশ যে শয্যাশায়ী অবস্থায় পাঁচ দিন কাটিয়ে দিলে, তার কারণ এই নয় যে, তার অঙ্গের উত্তাপ একবার মাত্র ৯৯-এ পৌঁছেছিল। তার কারণ তার পঁয়ত্রিশ বছরের অনূঢ় জীবন সহসা বিশে এসে ঠেকলো। এবং এইখানেই ছিল বর্ষার কারসাজি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে হু-হু করে, এবং টেবিলের ওপর দিন-পঞ্জিকাটা সারা সপ্তাহের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট-হীনতায় হাহাকার করছে, এই অবস্থায় শিল্পপ্রাণ ব্যক্তি কী করতেন জানি না। অমরেশ ম্যাণ্ট্‌ল্‌-পিসের ওপরে এক সারি বইএর মধ্যে থেকে এক-খানা টেনে নিয়ে আগুনের ধারে আরাম করে বসলো। বইখানার নাম "সাফো", লেখক আল্‌ফঁস্‌ দোদে। সেনের ধারে বুকিনিস্ত্‌-দের দোকান থেকে সেখানিকে পাতা-না-কাটা অবস্থায় সে পুরানো দরে কিনেছিল আজ পাঁচ বছর আগে, যখন সে ঐ লেখকেরই লেখা অন্য গ্রন্থকে টার্টারিন্‌ বলে না, বলে "তার্তারঁ্যা"। প্রথম পাতা কাটতেই চোখে পড়লো উৎসর্গ—A mon fils quand il aura vingt ans—আমার ছেলেকে, যখন সে কুড়ি বছরে পড়বে। তার পরের পাতা থেকে গল্পের সুরু—

দেখি, দেখি, কী সুন্দর চোখ! দক্ষিণে বাড়ী বুঝি? পারীর একটি বোহেমীয় জল্‌সায় অভ্যাগত দক্ষিণ-দেশী একটি কাঁচা বয়সের লাজুক ছেলেকে শুধায় একটি সুন্দরী যুবতী। বাংলা ভাষায় "সাফো"র অনুবাদ বেরিয়েছে, সুতরাং সে-বইয়ের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা করে মিছে সময় নষ্ট করবো না। এমন ঋজু ও প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপন্যাস আজ পর্যন্ত কেউ আরম্ভ করতে পারে নি। কথাকটির ঋজু প্রতিক্রিয়া অমরেশকে আবিষ্ট করে করে ফেললে। এবং সে ক্যাসেলের অভিধানের সাহায্যে মন্থর গতিতে বইখানির রসাস্বাদনে রত হলো। ভালো করে ফরাসী ভাষা জানলে হয়তো সে একদিন বা দুদিনেই বইখানি শেষ করে

ফেলতো, এবং শেষ করে বলতো, বা বেশ বই! কিন্তু সে যে কথার পর কথার মানে দেখে চললো, এতে শব্দার্থের ব্যঞ্জনা তার মনকে অনুষিক্ত করে আস্তে আস্তে দেহের চেতনাকে আঘাত করতে লাগলো। এবং ক্রমে বারে-বারে সে নিজেকে গল্পের নায়কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে লাগলো। ফলে নায়িকার আদর ও চুম্বন ইত্যাদি বাইরের অনর্গল বর্ষণের মত তার নিজের ওপরেই অবাধে বর্ষিত হলো। উত্তেজনায় তার সামান্য জ্বরো ভাব দেখা দিলে, এবং ঐ-অবস্থাতেই সে তার সমগ্র চৈতন্য ও চেতনা দিয়ে বইখানিকে পড়ে শেষ করলে।

যেদিন বৃষ্টি ধরণ করলে, তার আগের দিন রাত একটায় বইখানা শেষ হলো। সমাপ্তির দিকে বইখানার যে বিষাদ তা এক অদ্ভুত উপায়ে অমরেশের মনে তার নিবিড় দৈহিক প্রতিক্রিয়াকে নিবিড়তর করে তুললে। আপন নাগরীর সঙ্গে ইন্দোচীনে যাবার জন্যে ছেলেটি মার্সাই-এ অপেক্ষা করছে, এমন সময়ে প্রেমিকার চিঠি এলো, সে যেতে পারবে না। তাদের বয়েস ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য কম নয়, তাছাড়া সে পূর্ববর্তী প্রেমিকের সঙ্গে ঘরসংসার পেতে বসেছে। এ-ধরণের উপসংহারে অমরেশ একটু বিষাদ অনুভব করলে বটে, কিন্তু নায়ক-নায়িকার প্রথম পরিচয় ও সম্পর্কের চিত্রগুলি এতে আরো সজীব হয়ে উঠলো। তার কেবলই মনে পড়তে লাগলো দুটি-দৃশ্য : প্রথম, যখন নায়িকা নায়ককে প্রেমের ফাঁদে ফেলবার জন্যে বলছে— দেখি, দেখি, কী সুন্দর চোখ!—তার কয়েক পাতা পরে নায়ক

দক্ষিণ-দেশী পারীতে নবাগত ছাত্র, নায়িকাকে নিজের ঘরে নিয়ে চললো। আপন দয়িতাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে যখন সে তার বহু ওপরতলায় নিজের ঘরের কাছে নামিয়ে দিলে তখন নায়ক-নায়িকার বাক্যবিনিময়—

Enfin ! ব্যস্ !

Déjà ?—এর মধ্যেই ?

অত অল্প কথায় একটা সম্পূর্ণ নাটক আজ পর্যন্ত কেউ লেখেনি। অমরেশের কেবলই মনে পড়তে লাগলো—দেখি, দেখি কী সুন্দর চোখ !—এর মধ্যেই ? এই দুটি দৃশ্যের আবহ সেদিনকার বৃষ্টি-ভেজা, মেঘ-থম্‌থমে সকাল-বেলাটার সঙ্গে যোগ দিয়ে অমরেশের বয়সের অঙ্ক থেকে স্রেফ্ পনেরোটা বছর বেমালুম সরিয়ে ফেললে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই জানলা দিয়ে সে দেখতে পেলে, এপিং ফরেষ্টের উইলিয়াম্ দি কঙ্কারারের আমলের বড়-বড় গাছগুলো পর্বতশ্রেণীর ভ্রম ঘটাচ্ছে। তার ওপরে আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড একখানা কালো বর্ষণোন্মুখ মেঘ। ছেলেবেলায় পণ্ডিত মহাশয়ের হাজার ব্যাখ্যাতে সেও যা বুঝতে পারেনি, আজ তা উপলব্ধি করা কত সহজ ! মেঘালোকে ভবতি সুখিনো প্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ। তাই বলছি আজ অমরেশের চেতবৃত্তির এই যে বিকার ঘটলো তাতে ইংলণ্ডে অভাবনীয় মনসুনের মত এই বর্ষার কিছু কারসাজি ছিল নিঃসন্দেহ।

অমরেশ জানলা দিয়ে বাড়ীর বাগানটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেটা একটা ভিজে বুটীদার গালচের মত সপ্-সপ্ করছে।

দৃষ্টি-পরিধিকে সঙ্কুচিত করে তার দিকে তাকালে সেটাকে সত্যিই একখানা গাল্‌চে বলে ভুল করা চলতে পারে। অমরেশের মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে বিকেলের দিকে, কিটির সঙ্গে চা খাবার সময়ে, তার ফুলের কেয়ারী-দেওয়া লন্‌টির ঐ একটি উপমাই সে শুনেছিল—What a wonderful lawn, just like a rich Persian carpet, isn't it ? এই সূত্রে মনে পড়ে কিটির কথা, তার যৌবন-ভরা প্রতিটি অঙ্গ, তার প্রসাধিত কালো চুল, ইস্পানী ঢঙের খোঁপা, তার ঈষৎ উর্দ্ধমুখী আঁখি-পল্লব, তার "নাক্রে"-এর মত ঝক্‌ঝকে দাঁত, তার সত্যিকার পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠ। এই কিটি যদি তাকে গল্পের নায়িকার মত বলে—দেখি, দেখি, কী সুন্দর চোখ!—কথাটা মনে হওয়ায় তার প্রথমে হাসি পেল। কিন্তু সুন্দর চোখের কথা না তুলে ঐ ধরণেরই কোনো প্রসঙ্গের উত্থাপন করা কি তার পক্ষে অসম্ভব! মেয়েদের কাছ থেকে কোনো একটা সক্রিয় প্রস্তাবের উন্মাদনা যে কতখানি নিবিড় ও শক্তিশালী হতে পারে, অমরেশ তা সেদিনে তার চেতনার অণু-পরমাণু দিয়ে অনুভব করতে লাগলো, এবং বারে-বারে তার মনে পড়তে লাগলো—এর মধ্যেই, déjà ? এই বাদল-প্রভাতে কারো সক্রিয় বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তার দেহ-মন উৎসুক হয়ে উঠলো। কেবলই তার মনে হতে লাগলো, কিটির মত কে যেন তার মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছে—Come to my flat, come to supper, will you ? অমরেশ এর পরের প্রতিটি ঘটনা নিখুঁত,

জীবন্ত ও বাস্তবভাবে কল্পনা করবার জন্যে পাশ ফিরে শুলো। ঠিক এই সময়ে টক্‌টক্ করে দরজায় আঙুল দিয়ে শব্দ করে ট্রেতে ব্রেক্‌ফাষ্ট্ সাজিয়ে ঝি আন্‌না এসে ঘরে ঢুকলো।

Good morning, Sir.

Good morning, Anna!—অমরেশ প্রত্যেকটি কথার ওপর অসাধারণ জোর দিলে। প্রভুর কথায় অদৈনন্দিন আন্তরিকতার রেশটুকু আন্‌নার কান এড়ায় না, কারণ বক্তার অভিপ্রায় তা ছিল না। আন্‌না দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচকে হেসে ছোট টেবিলটার ওপর পরিপাটি করে ব্রেক্‌ফাষ্ট্ সাজিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—Shall I make zome toast, Mr. Ray?—উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অদ্ভুত মেয়ে এই আন্‌না! আল্‌সাসে তার বাড়ী, বাপ জার্মান, মা ফরাসী। সাধারণতঃ সে যেমন নির্লিপ্ত, সংযত ও আবদ্ধ, সামান্য উত্তেজকে সে তেমনি সহজভাবে আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত চপলতায় নির্লজ্জ গোলাপের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। তখন Sir থেকে Mr. Ray-এ জিহ্বাস্খলন যত ক্ষিপ্র গতিতে হয়ে থাকে, পাছে Mr. Ray থেকে Amaresh-এ জিহ্বাস্খলন তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে বেচারী অমরেশকে প্রায়ই সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। কিন্তু আজ এই ধরণেরই একটা অদৈনন্দিন, অভূতপূর্ব স্খলনের জন্যে তার মন উৎকর্ণ হয়ে রইল। শ্রেণী-সম্ভ্রম, আত্মসম্মান, প্রতিবেশী-শ্লীলতা

বন্ধু-পরিচিতদের শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রভৃতি যেসব করীন্থীয় স্তম্ভসমূহ তার সত্তাকে Mr. Amaresh Roy of Epping-রূপে খাড়া করে রেখেছিল, সেগুলো চোখের নিমেষে হুদ্দাড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আল্সাসী চাষার মেয়ে আন্নার উর্বর যৌবনের কাছে বাঙালী, বনেদী ঘরের নীল রক্ত পান্‌সে মনে হলো। চেল্সী, ব্লুম্স্‌বেরীর শিল্প-সখীদের জিইয়ে-রাখা কাম-বিলাস হাস্যকর বোধ হলো, আর ঐ বুল্‌ভার দেজিতালিয়াঁর রেস্তোরাঁ-বাসিনী উচ্চাঙ্গের মেত্রেস্‌রা আজ অমরেশের বিবমিষার উদ্রেক করলে।

অমরেশ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো আন্নার কথা। বেচারী আন্না, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কাজে ফুরসৎ নেই। সদর দরজার ঘণ্টার বোতাম ও নকার্ থেকে সুরু করে অমরেশের হ্যাট্-বাক্সের অব্যবহৃত টুপিগুলো পর্যন্ত মেড়ে-মুছে মেজে-ঘসে প্রতিদিন সাফ্ না করলে তার শান্তি নেই। আলু ছাড়াতে গিয়ে সে প্রায় রোজই একটা না একটা আঙুল কাটে। কাটা আঙুলটা ছোট্ট মেয়ের মত মুখে পুরে চুষতে চুষতে হাজির হয় অমরেশের কাছে—A leetle eeodin plis, if you don't mind, Sir. পোড়-খাওয়া আলুমিনিয়ুমের প্যান্‌গুলো Vim দিয়ে মেজে মেজে তার আঙুলগুলো তার সুপরিমিত, সুষ্ঠু দেহের আনুপত্যকে ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকমে মোটা হয়ে উঠেছে। পিয়ানোফর্তের ওপর ঐ আঙুলগুলোকে কল্পনা করলেও গা সির্-সির্ করে। কিন্তু তার শাদা ধব্‌ধবে এপ্রন ভেদ করে

যে স্বাস্থ্য হাতছানি দেয় তাকে প্রতিরোধ করা শিবেরও অসাধ্য। আর আজ যখন এই মেঘাশ্লিষ্ট সাম্বুর ভ্রম-ঘটানো কালো মেঘের তলায় এপিং ফরেষ্টের দৃশ্য জানলার ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় অমরেশের চোখের সামনে ঝুলছে, তখন কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ীজনের পক্ষে আন্‌নার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক নয় কী? বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র কয়েক ধাপ সিঁড়ি, একটুখানি বারান্দা, তার পরেই রান্নাঘর।

অমরেশের মনে পড়ে এক রাত্রির একটি দৃশ্যের কথা। দোতলায় তিনখানা ঘর। একটি তার শোবার ঘর, একটি তার পড়াশুনো করবার জন্যে, তৃতীয়টি অতিথিদের জন্যে। সামনে দিয়ে অপরিসর বারান্দা, তার ওদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে অ্যাটিকে। এই অ্যাটিকেই আন্‌না থাকে। আগে এখানে থাকতো তার নিজের আঁকা ক্যাম্বিসের ওপর নানা ধরণের প্রতিভার উল্লাস, যখন সে মনপ্রাণ দিয়ে সুধু চিত্র-শিল্পী হতে চেয়েছিল। সে-গুলোতে একদিন অগ্নিসংযোগ করে সে মাত্র রূপ-বোদ্ধা হিসেবে ঘরসংসার গুছিয়ে বসলো, এবং ফান্ হক্-এর আর্ল অঞ্চলে উইক্-এণ্ড্ কাটানো ক্রমে বিরল হয়ে উঠলো। সেই সময়ে অমরেশের এক আল্‌সাসী কবি বন্ধু আন্‌নাকে পাঠিয়ে দিলে তার কাছে। ভারী গুছনো, খাটিয়ে মেয়ে—**Ein maedchen fuer alles.**

আন্‌না এপিঙে এসে পৌছলো সন্ধ্যার পর। আগের দুদিন সারাক্ষণ ট্রেনে কেটেছে, টহলের ক্লান্তিতে তার গা টলছে, জামা

বোঝে না। তার অনর্গল জার্মান কথা থেকে অমরেশ মাত্র একটিকে কতকটা চেনা বলে খপ্ করে ধরে ফেলেছিল, যে-কথাটা জার্মানীর হোটেলে সে প্রায়ই শুনতো—Schlafzimmer, শোবার ঘর।

আন্না বলে—Bitte, mein Schlafzimmer. অমরেশের কানে আসে শুধু Schlafzimmer. বুঝতে পারে না, হঠাৎ সে শয়ন-কক্ষের খবর নেয় কেন, ভাবে হয়তো কাজের মেয়ে এখনই প্রভুর বিছানাটা করে ফেলতে চায়। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে আপন শয়ন-কক্ষের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার তার সময় নেই। আজ তার সাপারের নিমন্ত্রণ। ইংরেজীতে আন্নাকে সে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করে, আজ তার কাজ করবার দরকার নেই, কাল থেকে করলেই হবে। আজ তার সাপারের নিমন্ত্রণ, নীচে রান্নাঘরে আন্নার জন্যে খাবার আছে, সে যেন তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আন্না তার এক বর্ণও বুঝতে পারে না, কাঁধ-দুটো তুলে সে ইশারায় বলে, বোঝে না। নিরুপায় হয়ে অমরেশ কালোয়াৎদের মত একটা কানের তলায় হাত রেখে, মাথা হেলিয়ে কৃত্রিম নাক ডাকিয়ে বুঝিয়ে দেয়—Go to sleep, Schlafen, ja?—Danke Jhnen vielmals, ja, ja, ich bin so muede! ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—ja, ja, gewiss. Danke, danke! অমরেশও তাড়াতাড়িতে Aufwiedersehen-এর বদলে বলে, Danke. পরমুহূর্তেই বাইরে থেকে সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছোটে স্টেশনের দিকে।

রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে ক্লান্ত অমরেশ কোন রকমে টলতে টলতে ওপরে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের দিকের জানলাটায় পর্দা টানা, বেড্‌-কভারটি পরিপাটি-রূপে পাট করে পাশের চেয়ারের ওপর রাখা, আর তার বিছানায় শুয়ে পথশ্রান্ত, বিবস্ত্র আন্‌না! শোবার আগে ঘরের দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করতে বেচারীর মনে নেই।

তখন গরমকাল, নিচের ড্রইংরুমে সেটী-র ওপর অমরেশের রাত কাটলো। একটা কথার ভুলে সে-রাত্রে তাদের মাঝে যে প্রকাণ্ড ভুলের সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিণতিটা অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছত কি না, অমরেশ আজ এই মেঘ-থম্‌থমে সকাল-বেলায় শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলো। ঘটনার পরের দিন আন্‌নার ভুল ভাঙাবার সময়ে তাদের দুজনেরই মনে যে-দৃশ্যটা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল এবং যে-কথা তারা কেউই উল্লেখ করলে না, তিন বছর আগেকার সেই রাত্রের সেই দৃশ্যটা দুজনের মনেই আজও সমান সজীব। একজন দেখেছিল, অপর জন জানতো তাকে দেখেছে। দুজনের মনের মাঝখানে এতবড় একটা সেতু আকছার মেলে না। তাদের মনের এই গোপন সেতু পার হলেই তো একজন আর একজনের কাছে অনায়াসে এসে পৌঁছতে পারে! থালার ওপর রেকাব চাপা-দেওয়া খান-আষ্টেক গরম-গরম টোষ্ট্‌ নিয়ে আন্‌না ঘরে এসে ঢুকলো। এবার সে দরজায় করাঘাত করলে না, আসতে পারে কি না, সে কথাও জিজ্ঞেস করলে না।

সকালবেলায় দরজায় টোকা না দিয়ে ঢোকার পথটাকে যে-সব ছোট-খাটো সঙ্কট আকীর্ণ করে রাখে, আন্না সেদিন হয়তো স্বেচ্ছায় সেগুলোকে বরণ করে নিলে, অমরেশের মনে হলো। হয়তো এরকম ব্যবহার শোধ-বোধের একটা ফিকির। লেন-দেন হতে হলে দু-পক্ষেরই প্রাপ্য ও দেয়-র হার সমান সমান না হলে লাভ-লোকসানের অসামঞ্জস্য থেকে যায়, পণ্যে-মূল্যে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতিতেও তাই নয় কি? অমরেশের মনে হয়, আন্না আজ যেন একটু বেশী অধোমুখ, বিছানার খুব কাছে সরে এসে টেবিলের ওপর রেকাবে সে ঐ Vim-এ হাজা আঙুলগুলো দিয়ে টোষ্ট্‌গুলো একটি একটি করে সাজিয়ে দিচ্ছে। পিয়ানো-ফর্তের ওপর ঐ আঙুলগুলো, অমরেশের আবার গা সির্‌-সির্‌ করে ওঠে। এপ্রনের গলার কাছে আন্নার বুকের যুক্ত-কোণ দেখা যায়, হাতের, মুখের মসৃণ চামড়া, সুপরিমিত কটিদেশে এপ্রনের ফিতের আলিঙ্গন, পেছনদিকে বাহারে ফাঁসের গাঁট, বাহুর কুটিল রেখা একটির সঙ্গে একটি এমনভাবে এসে মিশেচে যে, মনে হয় আঞ্জেলোর খস্‌ড়া, মুখখানি ভরাট, মাংস চর্বির পাষাণ-ভাঙ্গা ওজন নেই, গালের টোল দুটির গভীরতার জন্যে যতটুকু দরকার, চাষার মেয়ের উর্বর রক্তের দৌড়-ঝাঁপের যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী এক তিল উদ্বৃত্ত মাংস আন্নার দেহে নেই। অমরেশ আঁকিয়ে ও রূপ-বোধী হয়েও এমন অঙ্গ-সামঞ্জস্য কোথাও দেখেনি। ভেনুস্‌ দ্য মিলোর শরীরের যেটুকু আন্দাজ করা যায়, তার মধ্যে স্থধু ইতালীয় থল্‌থলানী। হবে না? অত

ময়দা আর অলিভের তেল খেলে ইংরেজ মেয়েরাও ছু-মাসে রাজস্থানী মেয়েদের মত হয়ে উঠবে। ও তোমার বস্তিচেল্লী, দা ভীঞ্চি, সবারই এক অবস্থা। মাংসের বোধ আছে কিন্তু আঞ্জেলোর মত পেশী-বোধ নেই। অমরেশের মনে হয়, একমাত্র আঞ্জেলোই মানুষের দেহ আঁকবার অধিকারী। কারণ তাঁর শরীরতত্ত্বে সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। স্তুদিও-কে আনাতমিয়া-ঘরে পরিণত না করলে জগতের মুজেউমগুলোতে শুধু পোটোপাড়া, কুমোর-ঠুলীর ঢলঢলে মুখ, থল্‌থলে শরীরের প্রতিমার হেরফের জমা হবে। অমরেশের গা ঘুলিয়ে ওঠে, ময়দা আর অলিভের তেল, আটা ঔর ঘিউ, ভাত আর সরষের তেল। আন্‌নার স্বাস্থ্য এপ্রনের বাধা মানে না। তার শরীরের বাঁধুনি তার প্রতি অঙ্গে মাংস-পেশী, শিরা-উপশিরা, রক্ত-মজ্জার একটি স্বাভাবিক, আবিষ্ট টঙ্কন ফুটিয়ে তোলে। চরম অনুভূতির টঙ্কন।

আন্‌না টোষ্ট্‌ সাজিয়ে পেয়ালায় কালো গাঢ় কাফি ঢালে, তারপর তার সঙ্গে মেশে ঘন ক্রীম। বাদামী কাফির সঙ্গে আ-পীত ক্রীম অবাধে মেশে। ক্রীম চলে যায় তলায়, তারপর একটু একটু করে ওপরে ভেসে ওঠে। হয়ে ওঠে এক পেয়ালা কাফি, বাদামী-হল্‌দে, পীতাভ রক্ত, রক্তাভ পীত। আজকের এই কাফি-ক্রীমের বর্ণ-সঙ্কর অমরেশের মনে এক অ-দৈনন্দিন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। সে তাকায় নিজের হাতের দিকে, তারপর আন্‌নার বাহুর ভেতরদিককার ক্রীম-রঙের মসৃণ চামড়া তার চোখে পড়ে স্পষ্ট হয়ে, অন্যদিনের চেয়ে স্পষ্টতররূপে।

বর্ণসঙ্কর কথাটা সম্বন্ধে যে-সংস্কার ও প্রাগ্‌বিচার পুরুষানুক্রমে শ্রীভগবান থেকে আরম্ভ করে মনু ও মনুর বড়-মেজ-ছোট-খাটো অনুচরবর্গের শাসন, অনুশাসন, অভিশাসনের আওতায় তার মনের খাঁজে খাঁজে বাসা বেঁধেছিল, তারা সবাই একে একে আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে বসে অমরেশের আজকের এই মেঘ-থম্‌থমে সকালবেলাকার অন্যথা চেতবৃত্তির বিচার করতে বসে। তার কানে-কানে কে যেন পণ্ডিতমশায়ের পূর্ববঙ্গী উচ্চারণে ফিস্‌-ফিসিয়ে বলে—জায়তে বর্ণসঙ্করহ্‌। ভারতবর্ষের এত বড় দুর্দিনের সম্ভাবনা শ্রীভগবানও হয়তো সইতে পারতেন না—অর্জুন এই ঘোর বিপদের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যদি তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন—জায়তে বর্ণসঙ্করহ্‌। কাফি আর ক্রীম মিশুক পেয়ালায়, তা মুখে তুলুক ইংরেজ, ফরাসী, রুশী, বুল্‌গার, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, তুর্ক্‌, আরব, চীনা, এস্কিমো, সাময়েদ্‌* মালয়, হাব্‌শী, বুশ্‌ম্যান, সাঁওতাল, ইরাণী, তুরাণী, হাঙ্গারী, ফিন্‌ন্‌, লেপ্‌চা, লাপ্‌প্‌—কিন্তু কাফি-ক্রীমের চাম্‌ড়ায় চামড়ায় যেন মিল না হয়, হে পরমেশ্বর, জায়তে বর্ণসঙ্করহ্‌ !—Shocking, my dear !—There was a girlie from Sharky. And she met a darky. She had three brats, a white, a black and a khaki !!—Ha, ha, ha ! Funny, isn't it ?—Look here, Sarah, I must warn you beforehand lest you

*"স্ব-ভুক্‌", রুশদেশের উত্তরপ্রান্তের উপজাতি।

should repent later. Keep these Indian boys at arm's length. Don't you know, er, I mean, you may like their brown skin snd dark eyes, I dare say they are handsome in a way, but you know what I mean.—Yes, ma'am I knau igzactly woch you mean ma'am ! I guess I better be careful any'ow !—অমরেশের মনে পড়ে লিঙ্কন্স্ ইনের কমন-রুমের মস্করা আর তার এক পুরানো ল্যাণ্ড্লেডী ও নব-নিযুক্তা পারচারিকার বাক্যবিনিময়। জায়তে বর্ণসঙ্করহ্।

অমরেশের পেয়ালায় কাফি-ক্রীমের ওপর ঠাণ্ডা সর পড়ছে, টোষ্ট্ নিউরে গেছে, মাখন গলে থল্থল্ করছে, বেকন ভিজে পাঁপরের মত নেদ্-নেদে। আন্নার ব্রেক্-ফাষ্ট সাজানো আর শেষ হয় না! এপ্রনের আঁচল দিয়ে ট্রের কানা মুছে সাফ্ করে দেয়। বাহু সঞ্চালনে তার বুকের যুক্ত-কোণের বাহুদ্বয়ের কুঞ্চন-প্রসারণ। জায়তে বর্ণসঙ্করহ্। অমরেশের আবার মনে পড়ে সাফোর দুটি দৃশ্য—দেখি দেখি, কী সুন্দর চোখ! এর মধ্যেই—déjà ! অমরেশ আন্নার বাহুর ওপর নিজের হাতখানা রাখে, বলে—Coffee and cream funny isn't it, Anna ?

Okh ja, I like zee kolor fon koffee ferry much, Mr. Ray.

Do you ? And I like cream.

Do you ? Funny, isn't it ?

অমরেশ আন্‌নার হাতখানা তার নিজের দিকে টেনে নিতে যায়। আন্‌না প্রতিবাদ করে—

Not now plis, Mr. Ray, I haff zo much wo-ork to do, plis not now.

When ?

আন্‌না চুপ করে থাকে।

When ?—অমরেশ তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করে।

Vell, I don't know. Prhafs after lunch.

চুক্তির ওপর চুম্বনের শীল-মোহর। অমরেশ তাড়াতাড়ি পোষাক পরে। তারপর রেন্‌কোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ছড়ি ও টুপির কথা মনে থাকে না। বারোটা বাজে প্রায়। একটায় লাঞ্চ্‌। আন্‌না যদি রাজী হয় তো আজ এক টেবিলে লাঞ্চ্‌ খেলেও চলে। কেই বা দেখতে আসছে? পাশের বাড়ীর Mrs. Ramsbottom-এর বাগান থেকে তাদের খাবার ঘরের ছবিগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। পর্দা টেনে দিলেই চলবে। তার ঘরে, না আন্‌নার রোম্যান্টিক্‌ অ্যাটিকে? অ্যাটিক্‌ই ভালো। আর্ল্‌-এর মাঠে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চাষার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, ফিকে হলুদ রোদ্দুর, মাষ্টার্ড্‌ আর ভিনিগার রঙের তার ফ্রক্‌, লাল কালির রং রুমাল, মাষ্টার্ড্‌ আর নীল কালি মিশিয়ে যে সবুজ হয়েছে, তাই দিয়ে মাঠ আর দূরের গাছের সারি। ছাঁকা ফান্‌ হক্‌ বলে অনায়াসে চালানো যেতে পারে। পায়ের দিক থেকে ছবিটা আঁকা হয়েছে। সুধু এই-

টুকুতেই ফান্ হক্-এর শিল্পের উদাসীন সন্ন্যাস-বৃত্তির অপলাপ করা হয়েছে। ইউরোপীয় আঁকিয়ে হলে সেটা হতো না। মাঠের ওপর একটি মেয়ে পা ছড়িয়ে, বুক চিতিয়ে ঘুমোচ্ছে, তার ঘুমের আরাম, তন্দ্রার আবেশ, মাটির ওপর তার এলানো অঙ্গের আত্মসমর্পণ, এছাড়া শিল্পীর আর কী দেখবার আছে? অমরেশের আঁকা ছবিখানাতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাথর-কাটা কাম আর কাশীর নেপালী শিব-মন্দিরের কাঠে-কোঁদা লালসার রেশ। হলোই বা। কাম-শাস্ত্রের দেশ আমাদের, আমরা প্রাচীন দেশের মানুষ, দেহের ক্ষুধা বেশী না হলেও সেই বুভুক্ষার ফেনিয়ে ফেনিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খুটিনাটির কল্পনা, বিছানায়-পড়ে-থাকা রোগীর পোনা-মাছের কালিয়ার দিবাস্বপ্ন, বৈঠকখানার চৌকির ওপর হুঁকোর ধোঁয়া দিয়ে সেঁকা কাম। **Smoked herring, kipper,** হয় না হয় জিজ্ঞেস করো বুড়োটাকে। অমরেশের মনে আবোল-তাবোল কথাগুলো আল্‌বোলার ধোঁয়ার মত দিক্-ভ্রষ্টভাবে পাকিয়ে পাকিয়ে ওড়ে। কলকাতার ঘিঞ্জী পাড়া থেকে সে আবার এপিং ফরেষ্টে ফিরে আসে এক মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কেটে-যাওয়া ঘুড়ীর হাত-সুতোর মত চিন্তার সূত্র পায় তার মনের লাটাইয়ে। আর্ল্-এর চাষার মেয়ের ছবিটা, যেটা অ্যাটিকে ছিল, তারই আঁকা, হয়তো লিয়ঁ প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেত। অমরেশের বয়েস তখন এখনকার চেয়ে অল্প ছিল। কানের কাছে চুলে পাক ধরেনি, ছবিখানাতে যে কাম ছিল, তারই মনস্কাম কি আজ পূর্ণ হতে চললো? যে-মেয়েটিকে

দেখে ছবিখানা এঁকেছিল, তাকে কল্পনায় অধিকার করা যত সহজ, বাস্তবে জয় করা কি তত সহজ? ভালোবাসা না পেলে এদের দেহ থাকে আড়ষ্ট, মনের দোরে হুড়্‌কো-দেওয়া। ফুল-শয্যার আগে চাই ফ্লার্টেশনের কুশণ্ডিকা। ইউরোপে ভারতীয় যুবকদের না যাওয়াই ভালো। তারা বুড়োটে দেহে-মনে, সর্বত্র, সর্বাঙ্গে। ঝটপট্ কাজ সারতে চায়, এ পাতে মাংসের চপ্, চিংড়ীর কাটলেট্, রুই মাছের কালিয়া, কৈ মশাই দিন্ না এদিকে, সুপ্-সাপ, হাপুস্-হুপুস্, স্-স্-স—ঢেউ-উ ঢেউ-উ, কাল উঠবে চোঁয়া ঢেকুর, বেড়ে রান্না হয়েছে! অমরেশ তার সখীদের কাছে স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে এ ধরণের কুৎসা কম শোনেনি—They're just a spot too greedy, impatient—হবে না? হাজার হাজার বছর ধরে যে ক্ষুধা জমে উঠেছে দেহের স্তরে স্তরে, স্নায়ুমণ্ডলীর খাঁজে খাঁজে! জেলের ভাত-খাওয়া সত্যাগ্রহীকে সটান এনে ছেড়ে দাও দেখি বিয়ে-বাড়ীর ভোজের পংক্তিতে! খেতে সে বেশী পারবে না, কিন্তু খাওয়ার সে কি দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি! হ্যাংলা কুকুর আর ন্যাংলা ভিখিরীর মত। আর্ল-এর চাষার মেয়েকে সে এঁকেছিল সুধু তার দেহের বুভুক্ষা দিয়ে নয়, তা না মানলে চলবে না। যে রূপ-সমালোচক সন্ন্যাস-বৃত্তির কথা তুলেছিলেন, তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্য জানা নেই। নেংটী-পরা, স-শৃঙ্গল নাগা সন্ন্যাসীদের দেশে কাম-সূত্র! বিদেশীদের চক্ষু dough-nut! মস্করাটা মন্দ নয়, ভারতীয় আড্ডায় বারংবার পুনরুক্তি করে হাততালি পাওয়া যায়। আর্ল-এর মেয়েটি বদ্‌লে

গেল আল্‌সাসী মেয়ের রূপে, মাষ্টার্ড আর নীল কালিতে আঁকা মাঠ হবে শাদা ধব্‌ধবে বিছানা, আন্‌নার নিজে হাতে কাচা চাদর, তার অ্যাটিকে। তাকে বিয়ে করা চলবে না, আন্‌নাও তা চায় না, সে বিয়ে-করা নেকী বৌ নয়, ম্যারেজ-সার্টিফিকেট্‌ নিয়ে হবে কী? কাগজের টুক্‌রোয় লেখা সঙ্গতির ছাড়পত্র দেখিয়ে সে খোরপোষের দাবী করবে না। বাবা জার্মান মা ফরাসী, যেমনি খাঁটি তেমনি চটুল। At my own risk—Mais parle-moi d'amour! আন্‌না যে আজ তিন বছর পরে এক কথায় নিজেকে অমন সহজভাবে সঁপে দিতে রাজী হলো, তার মধ্যে শুধু কি তিন বছরের অন্তঃশীলা কামনাই বহিস্রোতা হয়ে উঠলো? বিশ্বাস হয় না। ভালোবাসা চায় বৈ কি! ঝটপট্‌, দই-মিষ্টি, তাড়াতাড়ি, পাছে ফুরিয়ে যায়। আল্‌সাসী চাষার মেয়ের উর্বর রক্ত বুড়োটে ভোগ-লালসার তীব্র প্রতিবাদ করবে। কেন অমরেশের কি তা জানা নেই? আজ সারা সকাল ধরে আন্‌না ভাবছে লাঞ্চের পর একটি মধুর, অ-দৈনন্দিন সম্ভাবনার কথা, দুপুর গড়িয়ে যাবে, তবুও তার স্বপ্ন ফুরোবে না, সুদূর-গামী পথ তার মনের সুমুখে চক্রবালে গিয়ে মিশবে, পথের ধারে ছোট ছোট বিস্ময়, হল্‌দে পাকা ক্ষেতে লাল-টকটকে পোস্ত ফুল আত্ম-গোপন করেছে রাই-শস্যের মাঝে, ছোট্ট এক ঝাড় ভুলো-না-মোরে ফিকে বেগুনী রঙের, শুক্‌নো দাঁত্তলিয়ঁর তুলো ফুঁ দিয়ে পরস্পরের মুখের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া, শাস্তির ছুতো করে চুমু দেওয়া-নেওয়া, তারপর নবকর্ষিত ক্ষেতের ওপর এক ঝাড় পাকা

ঝবের আড়ালে, পথিকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা শোবে পাশা-পাশি, নীল, উদার আকাশের তলায়, সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবে, তারা উঠলো একটি একটি করে, কে কটা গুনতে পারে, দেহের অবসাদে পড়ে চাঁদের আলো, চাঁদ ঢলে পড়ে ক্লান্ত রাত্রির বুকে, ফিকে ভোরের চোখ রাত-জাগায় হলো ঝাপ্‌সা, শিশির-ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে বাড়ী-ফেরা তাড়াতাড়ি, দুজনে দুপথ দিয়ে, হয়তো খুঁজতে পাঠিয়েছে, বাপ্‌কে বলবে কী, কাফি-রঙের চামড়া, কাফি আর ক্রীম, দিক্ না বাপ্‌ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, তার দেহের অধিকারে বাপের হুম্‌কি, রক্তের ডাক হুম্‌কি মানে না। আর্ল-এর বাদামী-সবুজ মাঠ, আল্‌সাসী চাষার মেয়ের হাতে কাচা নিখুঁত শুভ্র বিছানার চাদর। অমরেশের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অমরেশ প্রকাণ্ড ছাতার মত লাইম্‌-গাছের তলায় বেঞ্চীটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সাড়ে বারোটা বেজেছে। একটায় লাঞ্চ্‌। বেড়াতে বেড়াতে এপিং ফরেষ্ট্‌ ছেড়ে সে বড় রাস্তায় উঠে এলো। চওড়া রাস্তা লন্ডনের দিকে চলে গেছে, পাশে একটুকরো ঘাস-জমী, একপাশে বেঞ্চী পাতা সাম্‌নের দৃশ্য দেখবার জন্যে হয়তো ততটা নয়, যতটা আধা-বয়সী বা বুড়ো আইবুড়ো কেরানীদের শিকার ধরবার জন্যে, দাও ভালো টোপ্‌ তোলো টপাটপ্‌, Come to supper at Lyons Corner House, তার ওপর five bob, কচিৎ half a guinea, দিন বুঝে, শনিবারে চড়া বাজার, province-থেকে-আসা ব্যবসাদাররা খুশী হয়ে দেয় এক

guinea, ডাক্তার-ব্যারিষ্টারেরা কামাক্ দেখি ! ঘাস-জমীটা সতীর মত নিষ্কলঙ্কা দিনের আলোয়, রাতে তার অন্য চেহারা, অমরেশ হাজার বার দেখেছে, তার হাসি পায়, রাতে দলিতা, প্রভাতে নমিতা, পুরোনো ছাতা-পড়া মস্করা, উপমাটা কার যেন, খোঁচ সহজে ধরা পড়ে, চুলোয় যাক্‌গে ! নমিতার বুকের ওপর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভিড়, কুলটা সিঁদুর পরে হয়েছে গৃহিণী, মেত্রেস্ হয়েছে স্ত্রী, ম্যারেজ-সার্টিফিকেট্। হাওয়া খাবার পক্ষে ভারী সুবিধা ঘাস-জমীটা, ছেলেমেয়েগুলো বাড়ীতে তুপোতুপি করছিল, লাঞ্চ্ পর্যন্ত ন্যানীরা তাদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। ঘাস-জমীটার ওপর কচি বয়েসের খেলা-ধুলো, কাঁচা বয়েসের লীলাখেলা, ডাঁসা বয়েসের কামলীলা আর পাকা বয়েসের মনস্কাম !

ন্যানীদের ফুলো গাল, রেনেট্-আপেলের মত সোণাচে-লালচে, দাঁতের দাগ বসানো, কার না লোভ হয়, বাঁধানো দাঁত যাদের তারা ছুরী দিয়ে কেটে মুখে পুরবে, আপেলের খোসায় ভিতামিন, তবুও না ছাড়ালে চিবোবে কে, কাঁচা দাঁত বাধা মানে না, কাল বুঝি maids'-afternoon-out ছিল ? ইংরেজ মেয়েরা ম্যারেজ-সার্টিফিকেট্ চাইত, আর না হয় খোরপোষ ; জার্মান, বেলজ্, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমারী, ফিন্‌ন্, এস্তোনী, স্লেভন্, এরা চায় মনের খোরাক আর দেহের সবটুকু উজাড় করে দেওয়া-নেওয়া, দেহের পদ্মাসনে না বসলে মন ওপরে ওঠে না, ইংরেজদের মত মনস্কামের জিহ্বা-দন্তের চক্‌চকানি এদের থাকে

নেই, দেহের রুচি, রসনা ও অশনের আনন্দ এদের কাছে সব চেয়ে বড়, নিজে খাবে তার পর বদ্‌হজম হলে কাঁচা ছেলেদের পাকা বাপেদের কাছে ক্ষতিপূরণ চায় না এরা, সত্যি-মিথ্যে ইংরেজ ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে দেখো। Maids'-afternoon-out এরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, লন্ডন, এডিনবুর, ডাব্‌লিন্‌, আবেরিষ্ট ইথে পাড়ায় পাড়ায় নীল আর লাল রক্তের বেগুনী সম্ভ্রান্তদের সংখ্যা বেড়ে উঠতো রক্ত-বীজের মত। বিদেশী ন্যানীগুলো safe outlet, শোননি একথা পাকা বাপের কাছে? কাঁচা ছেলে আর পাকা বাপের মাঝে মেলামেশাও দেখোনি? তবে, বিলেতে বসে করেছো কী এতদিন?

অমরেশ দৃশ্য দেখবার ছুতো করে ঘাস-জমীর ওপর বেঞ্চীটায় এসে বসে। পাশে একটি ন্যানী আড়-চোখে তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে সোয়েটার বুনছে, এক ঘর, দুঘর, তিন ঘর, চার ঘর, টানা চলেছে, তারপর পোড়েন, এক, দুই, তিন, গোনার শেষ নেই। ঘর গুলিয়ে যায় মেয়েটির, বিড়-বিড় করে বিদেশী ভাষায় কী একটা কটু-উক্তি করে, হয়তো এস্তোনী, বুক দেখে তাই তো মনে হয়, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, বুক-ভরা বুক, চোখ দুটো একটু ওপরদিকে টানা, ঈষৎ চাপা নাক, কাঁচা সোণার ওপর লালচে আভা রং, একটু লেপ্‌চানীদের আদল পাওয়া যায়, তরাইএ চা-বাগানে যে-সব লেপ্‌চানীরা কখনো কখনো কুলীগিরি করতে আসতো, অনেকটা তাদের মত দেখতে, অমরেশের মনে হয়। চেহারা দেখে আর্য বলে বোধ হয় না। হয়তো লাপ্‌প্‌ রক্ত

গায়ে আছে। লাপ্‌প্‌ আর লেপ্‌চা এক কি না কে জানে? কাঁচা বয়েসে যে লেপ্‌চানীর কাছে চুম্বনের বদলে পেয়েছিল চড়, এ দেখতে কতকটা সেই রকম নয় কী? চপলা উমা শিবের অনাশক্তিতে চঞ্চলা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী ছেলের বাছুরের মত গা চাটা সইবে কেন? মেরেছিল এক চড়! সেই অমরেশ আর এই অমরেশ! প্রেম-করার kunst তাকে দস্তুরমত কষ্ট করে শিখতে হয়েছিল একটি জার্মান মেত্রেস্‌-এর কাছে; নাচতে শেখার মত এ-জিনিষটাও শিখতে কম কসরৎ করতে হয় না। এস্তোনী কি ফিন্‌ন্‌ মেয়েটির দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে অমরেশ মনে মনে কাম-সৌধের সোপানগুলি একটি একটি করে অতিক্রম করে চললো। মনের আত্মগুপ্তির ক্ষমতা না থাকলে সমাজ অসম্ভব হয়ে উঠতো; শিষ্টতা, ভব্যতা, ভদ্রতা, ধাপ্পাবাজী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্রিজ-খেলা, ওকালতি, মাষ্টারী, পরকীয়া-চর্চা, ধর্ম, আচার, মন দেওয়া-নেওয়া, সভ্যতার সব অঙ্গগুলি বিকল হয়ে উঠতো। আল্‌-জিভের ওদিকে রাখো মনের কথাকে, তবে চলবে সমাজ, সভ্যতা। অমরেশের ভারী মজা লাগে, পাশের মেয়েটা সম্বন্ধে সে এমন কথা নেই যে কল্পনা করছে না, অথচ বেচারী কি তার এক বিন্দুও জানতে পারছে? মেয়েটাকে কিন্তু ভারী অদ্ভুত লাগছে। তার তির্যক চোখের বাঁকা চাহনি অসচরাচরিক বলেই অমরেশকে এক অদ্ভুত শক্তিতে আকর্ষণ করছে। এক জাতের পুরুষ অন্য জাতের মেয়েদের ওপর আকৃষ্ট হয়, আর মেয়েরা পুরুষদের ওপর। সুশ্রী, সুপুরুষ

ফরাসী জেনারেল আনামী, মালয় মেয়ের প্রেমে মজেছে, ইংরেজ মেয়ে নিগ্রোর প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, অমরেশ নিজে দেখেছে। বাঙ্গালীদের কথা ছেড়ে দাও, তাদের মিলন মেলে মেলে, শত-শত বছর ধরে যে কাফিতে ক্রীমেতে মিশেছিল ভারতবর্ষে, এখন তার ওপর অরুচি এসেছে। "কাফে-ক্রেম" হতে চায় স্রেফ্ "ক্রেম", তাই মাখো স্নো আর ক্রীম, কমলা-লেবুর খোসা আর সর, মাখো শাদা পাউডার, হয়ে ওঠো বেগুনী, দেখোনি ফিরিঙ্গীদের ধিঙ্গী মেয়েদের?

এস্তোনী না ফিন্ন্ মেয়েটি পশম আর কুরুশ-কাঠি ব্যাগে ভরে বেঞ্চী ছেড়ে উঠে গেল। অমরেশ একবার ভাবলে তার অনুসরণ করবে কি না। পেছু নেওয়ার সব ছলই তো তার সুখস্থ। মেয়েটি তাকে সারা এপিং ফরেষ্ট ঘোরাবে নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো সে তার তির্যক চোখের বাঁকা চাহনি হেনে উঠে গেল। সারাদিন বনে বনে ঘুরে ঘুরে বিকেলের দিকে সে যে তার সঙ্গে ঐ "চা-বাগানে" মাল্‌বেরী গাছের তলায় বসে ক্রীম দিয়ে ষ্ট্র-বেরী আর কারন্ট-জ্যাম্ দিয়ে গরম ক্রাম্পেটের সঙ্গে হাল্‌কা চায়না টী কুঁচের মত ঠোঁটে তুলবে, তা অমরেশ উত্তমরূপেই জানে। তারপর সন্ধ্যার সময় সে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে নানা ছল করে। কচি বীচ্-এর আওতায় মাটিতে বেছানো ফিকে বেগুনী রঙের ভুলো-না-মোরে আর নীল ব্লু-বেল্-এর ফুল-শয্যা। বাঁকা চোখ ওপরদিকে টানা, বুক-ভরা বুক। অমরেশের মনে পড়ে আন্নার কথা। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। সে

বেচারী তার জন্যে লাঞ্চ্ সাজিয়ে বসে আছে এতক্ষণ। বাড়ী ফেরা যাক্। অমরেশ মনে মনে ভাবে, লাঞ্চের পরে সে আন্নাকে পাঁজা-কোলা করে সিঁড়ি বেয়ে ওপর-তলায় নিয়ে যাবে। Enfin!—Déjà? ছেলেমানুষী। হোক্ না। মেঘ-থমথমে দুপুরে বাড়ীর ভেতরটায় গায়ে কাঁটা-দেওয়া, নেশা-খোরের চেতনার মত আবিষ্ট অন্ধকার, আন্নাকে বুকে চেপে ধরে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা!

ঘাস-জমীটার ওপর দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ছেলেদের ছোট্ট পুতুল-নাচের রঙ্গমঞ্চ কাঁধে নিয়ে জমীটার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর বাজিকর। সঙ্গে একটি ছোট্ট ফক্স্-টেরিয়ার, গলায় ঘুঙুর বাঁধা। কুকুরটা দুপায়ে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে কৌতুক সঞ্চার করে। তারা সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায়, সঙ্গে আসে ন্যানীর দল। বাজিকর কাঠের পায়ার ওপর ছোট্ট রঙ্গমঞ্চটা বসিয়ে তার পেছন-দিকে কাপড় ঢেকে দেয়। তারপর চিৎকার করে হরবোলার ডাক ডাকে, মোরগ-মুরগী, গরু, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চড়াইপাখী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে আস্তে আস্তে বিস্ময় ফুটে ওঠে, বিদেশিনী ন্যানীর দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে হাসতে। বাজিকর দু-এক জনের দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারে, তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে পথ-চলা লোক জড়ো করে আস্তে আস্তে। চলে এসো, চলে এসো, পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর খেলা! হরবোলার বুলী! কুকুরের ফক্স্-ট্রট্! কুকুর আর বাঁদরের একসঙ্গে লাঞ্চ্ খাওয়া!

বলতে বলতে বাজিকর জামার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট বানরের বাচ্চাকে বের করে মাটির ওপর ছেড়ে দেয়। বানরটা দাঁত খিঁচিয়ে কিচ্-কিচ্ শব্দ করতে করতে লাফ দিয়ে রঙ্গমঞ্চের বাক্সটার ওপরে গিয়ে বসে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা তার রকম-সকম দেখে হাততালি দেয় আর হাসে। অমরেশ তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে, অনাবিল কৌতুকে তাদের বিস্ময়-ভরা চোখের কোণে, ঠোঁটের রেখায়, চিবুকের টোলে, আর ফুলো-ফুলো গালে হাসির কুঞ্চন পড়েছে। ছোট্ট একটি দুবছরের মেয়ে, শাদা টেডি-বেয়ারের মত পোষাক-পরা, কপালের ওপর এক ঝুমকো সোণালী চুল, হাততালি দিয়ে হাসতে-হাসতে দু-একবার লাফাতে চেষ্টা করতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, আনী তাকে তুলে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়ে পোষাক থেকে ধূলো ঝেড়ে দিলে। মেয়েটি কর্তব্যের খাতিরে একবার ঠোঁট উলটে কাঁদতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পরক্ষণেই ফক্স্-টেরিয়ারের ফক্স্-ট্রট্ দেখে অন্য-অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। বাজিকর ঘণ্টা বাজানো থামিয়ে রঙ্গমঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে ডান-হাতটা কাপড়ের তলায় চালান করে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চের পর্দা সরে গেল। মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্চ্, টিয়া-পাখীর মত বাঁকানো নাক, আর দ্বিতীয়ার চাঁদের মত চোয়াল আর থুৎনী, ওপাশে জুডী, তন্বী তরুণী, ফিট্-ফাট্, ফ্রক্-পরা, দেখেই মনে হয় মেয়েটি পাঞ্চের দাম্পত্য-জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। পাঞ্চ্ আর জুডী দুজনেই ঘাড় নীচু করে এক অদ্ভুত

পুরুষ ও স্ত্রীর গলায় সমবেত জনমণ্ডলীকে অভিবাদন জানায়—Good morning, ladies and gentlemen, good morning children! ছেলেমেয়েরা অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, পরে কেউ কেউ প্রত্যুত্তর দেয়—Good morning! তাদের মুখের ওপর হাসির কুঞ্চন সরে গিয়ে বিস্ময়ের রেখা পড়ে। মানুষের মনের আদিম অনুভূতি বিস্ময় ও কৌতুক, ছোট্ট ছোট্ট মানবশিশুদের মুখের ওপর মেঘ ও রৌদ্রের মত পরস্পরকে অনুসরণ করে চলে। অমরেশের মনে হয়, জীবজগতের মূলে যেমন বুভুক্ষা ও সঙ্গম, তেমনি শিল্প-সৃষ্টির আদিতে বিস্ময় ও কৌতুক। শিল্প-বোদ্ধা অমরেশের চোখের সুমুখে শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্প-বোধের এই দুই আদিম নীতি আজ এই প্রথম মূর্ত হয়ে উঠলো। পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর পুতুল-নাচের বাজিকর হাতের কারসাজি আর কণ্ঠস্বরের চাতুর্যে এই ক্ষুদ্র, অনভিজ্ঞ নর-নারীর সরল, বিস্ময় ও কৌতুক-ভরা মনগুলিকে যে-ভাবে অধিকার করেছে, অতটা সৌভাগ্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, লেখক, চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞের জীবনে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। আর্টের সমঝদার সভ্য, শিক্ষিত, বয়ঃপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ মানুষ। নেশাখোর যেমন নেশার মৌতাতে দৈনন্দিন, blasé মনকে এক নিবিড়, আবিষ্ট অনুভূতির ক্ষণেক মায়ায় আবদ্ধ রাখতে চায়, বয়ঃপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ মানুষ ঐ-ধরণের এক অনুভূতির আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে চায় না কী? যে-মানুষের বিস্ময়ে মৈশে ধরেছে, কৌতুকে পড়েছে মরচে, তারই চেতনায় এই দুটি বৃত্তির ক্ষণিক পুনরুদ্বোধনের

উদ্দেশ্যেই আজ লাখে লাখে বই ছাপা হচ্ছে, সার্লর দেওয়ালে দেও-য়ালে রংচঙে ছবি, সিনেমা-থিয়েটারে মানুষের ঠেসাঠেসি, অপেরা, কনসের্ট-হল্ আতর আর ঘামের গন্ধে বিবমিষা-কর। তাই নয় কি? বাজিকর তার খেলা দেখিয়ে চলে। ছেলেদের এই পুতুল-নাচের নাটকে গল্প নেই, আছে সুধু ঘটনার পটপরিবর্তন আর বিস্ময় ও কৌতুকের হেরফের, টানা-পোড়েন, কখনো বা ভয়। পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর গল্প বাজিকর নিজেই জানে না। সুতরাং তার সঙ্গে এসে মিশেছে নানান্ রকমের নাঈফ্ কল্পনা, কখনো বা অন্য কোনো ছেলেদের নাটকের কোনো ঘটনা। এইমাত্র জুডী এসে পাঞ্চের গালে চড় বসিয়ে দিলে। ছেলে-মেয়েরা সে-দৃশ্যে কৌতুকে ফেটে পড়ে। তার পরই জঙ্গলের পটভূমি। কী ভীষণ জঙ্গল! পাঞ্চ্ ও জুডী জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেমেয়েদের মনে বিস্ময় ও ঘটনা-পারম্পর্যের দুর্দমনীয় ঔৎসুক্য জেগে ওঠে। তারপর হঠাৎ ঠক্-ঠক্ করে শব্দ হয়। কী এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার পূর্বপ্রত্যাশায় ছেলে-মেয়েদের মন টঙ্কিত হয়ে ওঠে। গাছ-পালার ছবির পেছন থেকে বেরিয়ে আসে লম্বা একটা কাঠের কুমীর। মঞ্চ থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে আকাশের দিকে তাকায়। ছেলে-মেয়েদের মুখে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয়, কেউ কেউ ভয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। হঠাৎ কাঠের কুমীর খট্-খটিয়ে ঠোঁট নেড়ে এক অদ্ভুত গলায় বলে—Gim'me a penny, gim'me a penny, will yah? ছেলেমেয়েদের ভয় ভেঙে

যায়, কাঠের কুমীরের কথা শুনে তারা হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে লাফায়। অমরেশও আপন অজ্ঞাতসারে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চিৎকার করে হাসে। খেলা থেমে যায় একটু পরে, স্থানীর দল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে-যার বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করে। লাঞ্চের সময় হয়েছে, খেলা দেখতে গিয়ে বেশ একটু দেরী হয়ে গেল। দেড়টা বাজলো প্রায়। অমরেশও ঢালু জমী বেয়ে তার বাংলোর দিকে নামতে সুরু করলে। পায়ের তলায় সবুজ, কচি ঘাস, একটু দূরে-দূরে হলদে-হলদে গর্স্-এর ঝাড় দেখা যায়। অমরেশের মনের সামনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উল্লসিত মুখগুলি ভেসে ওঠে একটি একটি করে। মনে পড়ে ছোট্ট টেডি-বেয়ারের মত পোষাক-পরা মেয়েটির কথা। মুখের ওপর আদিম বিস্ময়ের রেখাপাত আর অনাবিল হাসির কুঞ্চন। ছোট ছোট দুটি হাতের হাততালি আর অনাস্থ পায়ের নাচন। মাঠের মাঝে জায়গায় জায়গায় বুনো ষ্ট্রবেরী, গুস্‌বেরীর ঝাড় কোথাও বা একটা উইলো মাটির ওপর ঝুঁকে পড়েছে, দূরে এপিং ফরেষ্টের ঘনঘটা। প্রকাণ্ড একটা পপ্‌লার পথ আগলে দাঁড়ালো; অশ্বত্থ পাতার মত পাতা, কাঁচা, সবুজ, সরু পল্‌কা বৃন্তগুলিতে ঝির-ঝির করছে। গাছটা মিনারের মত সটান আকাশের দিকে উঠে গেছে। মূল থেকে আগা পর্যন্ত কোথাও তার এতটুকু অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না। অমরেশের blasé মনে আস্তে আস্তে এক অভিনব বিস্ময় জাগে। এর আগে কতদিন সে গাছটার পাশ দিয়ে চলে গেছে, যখন সে শীতে

কঙ্কালসার, আপন রিক্ততায় সঙ্কুচিত, বসন্তে যখন তার নবোন্মেষিত শাখা-প্রশাখা, শিরা-উপশিরায় প্রাণের প্রথম শিহরণ জেগেছে, গ্রীষ্মে যখন সে আপন পরিপূর্ণতায় আবিষ্ট, হেমন্তে যখন নিথর মধ্যাহ্নে একটি-একটি সোণারবরণ পাতা আলোর বুদ্বুদের মত ঘুরতে ঘুরতে নিঃশব্দে মাটিতে এসে পড়ে। আজ এই মাঠের মাঝখানে সরু পায়ে-চলা পথের ধারে পপ্‌লারটা অমরেশকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে। সে হাতের নাগালে ছোট্ট একটি পাতাকে বারংবার স্পর্শ করতে লাগলো, হাত, মুখ, ঠোঁট, কপাল, দিয়ে। ঠিক যেন শিশুর কোমল স্পর্শ। অমরেশের মন আস্তে আস্তে কিসের অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে। সে মাঠ ছাড়িয়ে চলে এপিং ফরেষ্টের দিকে। বহু-শতাব্দীবৃদ্ধ পাইন, ওক্, বার্চ্, লাইম্-এর পরিপূর্ণ পরিণতির আবেষ্টনের ভেতরকার থম্‌থমে অন্ধকার আর নিবিড় নিরাপত্তা, জায়গায় জায়গায় কচি কচি বীচ্, তার তলায় নীল ব্লু-বেল্, কোথাও বা এক ঝাড় জুনিপার, কতকগুলো নাম-না-জানা কাঁটার ঝোপ, তার ভেতরে চলেছে সমগ্র একটি পৃথিবীর জীবন-স্পন্দন, হাজার রকমের কীট-পতঙ্গ, কেউ বাসা বেঁধেছে, কেউ শুধু গাছগুলোর তলা দিয়ে গতায়াতের পথ তৈরী করেছে, কেউ বানিয়েছে আত্মরক্ষার সুড়ঙ্গ। কীট-পতঙ্গগুলোকে মানুষ বলে কল্পনা করলে, এই ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়গুলোকে বিশাল অভেদ্য অরণ্য বলে ভুল করা চলে। নিজেকে ঠিক তাদেরই মত ক্ষুদ্রকায় মনে করলে, তাঁদেরই সঙ্গে সার বেঁধে চলা যায় জুনিপার, ষ্ট্রবেরী, গুস্‌বেরী

ক্যান্‌ভাস্‌ আর তুলী নিয়ে বসবে। তার প্রতিবেশী এই বৃদ্ধ মহীরুহের সম্ভ্রমকে সে আবার নূতন করে রেখায় বর্ণে প্রকাশ করবে। তার বসবার ঘরের জানলা দিয়ে গাছটার যতটুক্‌ দেখা যায়, Mrs Ramsbottom-এর বাগানের খানিকটা বেড়া,. তার ওদিকে কতকগুলো গর্স্‌ আর জুনিপারের ঝাড়, একটা ঝুঁকে-পড়া উইলো আর ধূ-ধূ করা মাঠ। হ্যাম্প্‌ষ্টেড্‌ হীথ নিয়ে কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ যে-সব ছবি এঁকেছিলেন, এ তার নিঃসম্বল অনুকরণ হবে না। এতে থাকবে সুধু শতাব্দী-বৃদ্ধ বনস্পতির সম্ভ্রম। অমরেশের বৃদ্ধ প্রপিতামহের সর্বাঙ্গে এবং প্রতিটি কাজ ও কথায় যে বহু শতাব্দীর আভিজাত্য অতি সহজভাবে প্রকাশ পেত, সেই ধরণের সম্ভ্রম থাকবে গাছের প্রতিটি পাতায়, শাখা-প্রশাখায়। পেছনদিকে হবে মেঘলা রঙের আকাশ, ঘাসের ভেজা রংটি পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে হবে। বসবার ঘরের ভেতরটারও একটু দেওয়া চলতে পারে, সুধু একটা জানলা, আর দেওয়ালের বইয়ের সারির খানিকটা। হয়তো একটু রোমান্টিক হয়ে পড়বে। ক্ষতি কী? একশ বছরের পুরানো জিনিষ বলে কি আর রোমান্টিকতার দাম নেই? যে-কোনো শিল্প যেখানে কোনো রকমের সক্রিয় ব্যঞ্জনা প্রকাশ করছে, অমরেশের মতে সেই হচ্ছে শিল্প। ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, সুশ্রী-কুৎসিৎ অথবা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বা অনিষ্টকর, বুর্জোয়া বা কমুনিস্ত, শিল্পের মাপ-কাঠি নয়। জীবনকে আশ্রয় করে বা অতিক্রম করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নাম শিল্প, এই হচ্ছে শিল্প সম্বন্ধে অমরেশের

শাদা-মাটা ধারণা। এই সৃষ্টির আদিতে চাই বিস্ময়, নিতান্ত আদিম, প্রাথমিক বিস্ময়।

'অমরেশ মাঠ পার হয়ে তার বাড়ীর দিকে চললো। ঢালু, উঁচু-নীচু মাঠ। নীচে নামবার সময়ে সে ছোট ইস্কুলের ছেলের মত দু-হাত ডানার মত করে মেলে ধরে ছুটে চলে। কখনো থমকে দাঁড়িয়ে হলুদ রঙের বাটার-কাপ্ আর দাঁ-স্থ-লিয় তুলে তার দুই করপুট পূর্ণ করে। সামনে পড়ে খানিকটা উঁচু জমী, নীচে থেকে পাহাড়ের মত মনে হয়। অমরেশ গোড়ালীর ওপর ভর করে উঁচু জমী বেয়ে উঠে চলে। মনে পড়ে তার কিছুদিন আগে পড়া লণ্ডন মার্কারীর একটা কবিতার কথা। কবি সাসেক্স্-এর একটা ছোট পাহাড় বেয়ে উঠছেন। এই রকমই মেঘলা দিন, ভিজে ঘাস। পাহাড়ের ওপরে উঠে চোখে পড়ে যেন এক রূপ-কথার রাজ্য। ছবির মত ছোট একখানি গ্রাম, কুটীরের আঙিনায় আঙিনায় হানী-সাক্ল্ আর ওয়াল-ফ্লাওয়ার। অমরেশ উঁচু জমীটার ওপর উঠে আসে। চোখের সামনে ঐ-ধরণেরই একটা দৃশ্য তার গোপন বিস্ময়-লোক মেলে ধরেছে। টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। অমরেশ আবার ঢালু জমী বেয়ে ছুটে চললো। ঢালুর মাঝামাঝি তার বাংলো। লাল রঙের ছাদ, তার ওপর চেষ্ট্-নাটের পাতার গাঢ় সবুজ, মাথার ওপরে মেঘলা আকাশ। আড়াইটে বেজে গেছে।

নকারে ঘা দিতেই আন্না ছুটে এসে দোর খুলে দিলে—
Zo late ?—Yes, Anna, I'm very sorry. Lord, I'm so

hungry, aren't you? Let's have the eats. আন্না আভেন খুলে গরম লাঞ্চ্ টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেয়। একজনের জায়গা করা হয়েছে। অমরেশের সময় নেই। 'সেই ছবিটা আঁকতে হবে। প্লেস্-মাছ ভাজা পরিপাটি করে, তার পাশে দু-চাকতি মিহি করে কাটা লেবু। তারপর আসে চিকেন্, তার সঙ্গে আলু আর ব্রাসেল্স্ স্প্রাউটস্, খানিকটা সস্ আলাদা পাত্রে করে। আসে চীস্, আপেল। অমরেশ তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে। আন্না হেসে শুধায়—Are you in a hurry, Mr. Ray?—No, why, Anna?—I vas only asking. লাঞ্চের পর আন্না টেবিল সাফ্ করে রান্নাঘরে চলে যায়, অমরেশ ঢোকে তার বসবার ঘরে। ঐ জানলাটা দিয়ে চেষ্ট্নাটের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। তার ওদিকে অনেকদূর বেছানো সবুজ মাঠ। উইলোটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। অকাল-যুবতী Mrs. Ramsbottom-এর পোষাকের দু-একটা অপ্রকাশ্য অঙ্গ বেড়ার কাছে দড়ির ওপর শুকোচ্ছে। প্রতিবেশিনীর যৌবনের এই জয়পতাকাগুলোকে বাদ দিতে হবে। অমরেশ ওপর থেকে তার আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে এসে জানলার কাছে বসলো। ক্যান্ভাসের ওপর পড়ে রেখার টান, আস্তে আস্তে রেখাগুলো পল্লবিত হয়ে ওঠে।

বসবার ঘরের দোর ভেজানো। তার ওপর বাইরে থেকে মৃদু আঘাত পড়লো। আন্নার কী দরকার, আলু ছাড়াতে গিয়ে আবার আঙুল কেটেছে, বোধহয়।

Yes, Anna, what do you want ?

Shall I make your bed, won't you have zome rest after lunch ?

Why ?

I vas only saying.

No, thank you, Anna, you can have the afternoon off. Go to some picture, will you ?

আন্নার সন্তর্পিত পদশব্দ একটি একটি করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কলিকাতা,
১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৮

অবদান

ইঙ্গল্যান্ডের আকাশে-বাতাসে গ্রীষ্মের শেষ উষ্মাটুকু যতদিন টিকে থাকে ততদিন লন্দনী এবং লন্দনিনীরা প্রতি রবিবার সকালে ধারে-কাছের গ্রাম বা অন্য কোনো জনপদ অভিমুখে লাঞ্চ-বাক্স, বীয়ার-বোতল এবং পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে স-বেঞ্চ-রথ-যোগে (char-à-banc) শহর ছেড়ে চলে যায় সারা দিনের মত। এ-ধরণের অভিযাত্রার বিবরণ ইংরেজী-সাহিত্যা-মোদী ব্যক্তি মাত্রেরই পড়া আছে। সুতরাং, এবং যেহেতু এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য সাধারণ লন্দন-বাসীর সাপ্তাহিক গ্রামাভি-য়ানের বিবৃতি-বিষয়ক নয়, আমি একেবারে এই গল্পের ঘটনাস্থলে আপনাদের এনে হাজির করছি।

রবিবারের লন্দন সেদিন সন্ধ্যার দিকে ক্ষুব্ধচিত্তে সোমবারের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরছে। এবং যে অপেক্ষাকৃত

সংখ্যা-লঘু যুবক-যুবতী শনিবার সারা রাত নেচে, রবিবার সারা দিন ঘুমিয়ে গত রাত্রের বীয়ারের অবসাদ দূর করছে, তারা সপ্তাহান্তের শেষ অবকাশ ও মজাটুকু লুটে নেবার অভিপ্রায়ে উদ্দাম উদ্যম নিয়ে পথে বেরিয়েছে। এই বিপুল জন-সমুদ্রের মাঝে দাঁড়-সাঁতার ও ডুব-সাঁতার কেটে যে-যুবকটি হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলেছে, তাকে দেখে বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কোনো জাতের বলে ভুল করা চলে না। কারণ তার মাথায় খাস্ মাদ্রীদ্ থেকে আনা কালো রঙের চওড়া বেড়-ওয়ালা ইস্পানী টুপি, কানের-পাশে সেকেলে লন্দনী হ্যাক্নি-ক্যারেজ-ড্রাইভারদের মত গালপাট্টা, নাকের নীচে পর্তুগালী ধরণের টিকলো গোঁফ, পরণে মুর্শিদাবাদ রেশমের হাল্কা স্যুট, গলার চারিপাশ ঘিরে একটা মোটা কালো ফিতে তার জামার বুক-পকেটে প্রবেশ করেছে, পায়ে পালেস্তিনী স্যাণ্ডেল, চোখে মানুষটির ভেতরকার নির্বাপিতপ্রায় প্রতিভাকে অহোরাত্র উস্কে-রাখা একটুখানি আঁচ।

এতটাই যখন বলা গেল, তখন বাকীটুকুই বা বলতে আপত্তি কী? নামটা উল্লেখ না করলেও আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছেন, ইনি আমাদের জলধিবরণ বসু-মল্লিক। কলকাতার পথে-ঘাটে যে-লোকটিকে এক-মাথা ঢেউ-খেলানো চুল, গায়ে বিবেকানন্দী কোট, পরণে পায়জামা, পায়ে কটকী চটী, চোখে মোটা মোটা ডাঁটা-ওয়ালা শেলের চশমা পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, এবং যিনি এক সময়ে ফরাসী Mont Parnasse থেকে বে-জিঙ্গীর কবিতা-সুরধুনীকে বঙ্গ-সাহিত্যে অবতারিত

করেছিলেন, তিনিই যে এই লন্দন-প্রবাসী কবি জে. বি. তা খামখা বিশ্বাস করে নেওয়া কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু আবার বলি, রবিবারের সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড্ স্ট্রীট্ দিয়ে দ্রুত ধাবমান এই ব্যক্তিটি আমাদেরই সেই পুরোনো আমলের জলধিবরণ বসু-মল্লিক।

আপনারা যদি প্রশ্ন করেন, কবি জলধিবরণ লন্দনের এত জায়গা থাকতে অক্স্‌ফোর্ড্ স্ট্রীট্ দিয়ে চলেছেন কেন? তার উত্তরে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা চলে যে, তিনি দশ বছর বিলেত প্রবাসের পর তিন মাস আগে নিউ স্টেট্‌সম্যানে একটি চার পংক্তির জাপানী ঢঙের বে-জিঞ্জীর কবিতা ছাপাতে সমর্থ হয়েছেন, এবং তার পরের কবিতার জন্যে সম্প্রতি নানা ছুট্‌কো-ছাট্‌কা ইম্প্রেশন্ ও ইন্‌স্‌পিরেশন্ আহরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তাছাড়া আপনাদের দেশের সঙ্গে এদেশের ফারাক এই যে, এখানে ছাদের আল্‌সেতে মেলা হলুদের ছোপ-লাগা শাড়ী, দেশলাইয়ের বাক্সের ছবি বা মাসিক-পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে ইন্‌স্‌পিরেশন্ নিতে হয় না। এদেশের ইন্‌স্‌পিরেশন্‌রা দিন-রাত্তির পথে-ঘাটে খট্‌খটিয়ে হেঁটে চলে বেড়ান, এবং তাঁদের অনুধাবন-কার্যে একটু-আধটু অভিজ্ঞতা জন্মে গেলে রাত্তে-ভিতে পুলিস্‌ম্যানের চোখ এড়িয়ে তাঁদের দেউলের একেবারে দোর-গোড়ায় এসে হাজির হওয়া যায়। তারপর গোটাকয়েক পলকা অসম্মতির পরদা সরিয়ে ফেলা শুধু ব্যক্তিবিশেষের কারসাজির ওপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, কবি জে. বি.-র এ বিষয়ে

প্রচুর সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া গেছে। তা না হলে তিনি খামখা রবিবার সন্ধ্যায় এক অপরিচিত ইন্‌স্‌পিরেশনের অনুধাবন করতেন না। সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে পুণ্যাহ ভট্টারক বারের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব এই কারণে যে, যেমন আগেই বলা হয়েছে, রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত সময় প্রায় বারো ঘণ্টা, এবং যারা শনিবার সারা রাত নেচে রবিবার সারা দিন ঘুমিয়েছে, তাদের রবিবার রাতে ঘুমোবার প্রয়োজন হয় না, এবং রাতের অবসাদটুকু সোমবার কারখানা বা আফিসে আড়ামোড়া ভেঙে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

লন্দনের নানা দূর পল্লী থেকে কাতারে কাতারে যুবক-যুবতী রবিবার সন্ধ্যায় যে-জায়গাটায় এসে জটলা করে সপ্তাহান্তের শেষ উন্মাদনা-টুকু নিঃশেষে উপভোগ করবার আশায়, কবি জে. বি.-র ইন্‌স্‌পিরেশন্ সেদিন অক্সফোর্ড্ স্ট্রীট্ দিয়ে আৎলান্তা-বিনিন্দিত পদক্ষেপে ঠিক সেই-মুখোই ধাওয়া করছিলেন; এবং স্বয়ং কবি উক্ত রাজকন্যার পাণি-প্রার্থীর মত উঠি-কি-পড়ি অবস্থায় ভিড় ঠেলে চলেছিলেন এমনি একটা মনোভাব নিয়ে যার বাংলা পরিভাষা হচ্ছে : ঐরে, গেল, গেল, বেলে মাছটা পালিয়ে গেল।

অক্সফোর্ড্ স্ট্রীট্‌টাকে যদি একটা নদী বলে কল্পনা করা যায়, যা বিশাল হাইড্ পার্ক রূপ সমুদ্রে এসে মিশেছে, তাহলে উপরি-উক্ত উপমার জের টেনে এও বলা যাক্ যে, সত্যিই বেলে-মাছ-রূপিনী মীনকন্যাটি হঠাৎ এখানে এসে বিপুল জন-সমুদ্রে অন্তর্হিত

জন্যে তাঁর ফটোপটে বহুবার স্থান পেয়েছে। জ্বলন্ত পাইপে গোটাকয়েক টান দিতেই তাঁর উপস্থিত কর্তব্য একেবারে সূর্যোদয়ের আকাশের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। হস্তচ্যুতা "শ্যালিকাটী"কে তিনি সেই রাত্রেই যে-কোনো উপায়ে হোক খুঁজে বের করবেন, এই মর্মে একটা সঙ্কল্পোক্তি পাইপের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর কানের কাছ দিয়ে উড়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পাইপে ঘন-ঘন টান দিতে দিতে তিনি বেশ বড়গোছের একটা ভিড়ের কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। কবি জলধিবরণ মনে মনে বদ্ধপরিকর হলেন, তিনি এই রবিবারের রাতটাকে এমনভাবে অতিবাহিত করবেন যার বিবরণ শুনে তাঁর রুমুস্‌বেরীর বোহেমীয় বন্ধুরা একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করবেন : J. B. ought to write a book like Céline's Voyage au bout de la nuit. অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাক, ঐ রকম একখানা স্থূলকায় উপন্যাসের মালমসলা জোগাড় করবার জন্যেই জলধিবরণ উক্ত "শ্যালিকাটি" দ্বারা তাঁর রাত্রির অভিযাত্রা সুরু করবেন, এই সঙ্কল্প করে তিনি জনতার প্রান্তভাগে এসে কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ানোর পরই যে-দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো সে-কথা বললে আপনারা নিশ্চয়ই মনে করবেন, আমি গল্প বানাচ্ছি। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, জলধিবরণ রোমাঞ্চিত দেহে আবিষ্কার করলেন, তাঁর কাছ থেকে হাত তিরিশ দূরে আবিষ্ট মনে বক্তৃতা শুনছেন ঠিক সেই

মীনকন্যাটি যাঁর পশ্চাৎ-সন্তরণে জলধিবরণ কিছুক্ষণ আগেই গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠেছিলেন।

এ যে সেই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটি পাৎলা রেশমের ফ্রক্ মেয়েটির স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল দেহটিকে এমন পরিপাটিরূপে মুড়ে রেখেছে যে, তার ঐ সুসভ্য আবরণটি কতকটা বাহুল্য বলে মনে হয়। স্ত্রী-জাতির কোমর সম্বন্ধে পুরুষের কী ধারণা, আমার জানা নেই। তবে বঙ্গললনার স-ঘট কটিদেশ যখন বাঙ্গালী পুরুষদের একটি বিশেষ আকর্ষণ-স্থল, তখন এই মেয়েটির কোমর সম্বন্ধে একটা-আধটা কথা বলা চলতে পারে। মেয়েটির কোমর আছে, এবং এমন ভাবে আছে যে, তাকে দেখামাত্রই একটি ইংরেজী চলতি কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়—Take a woman by the waist. তার শরীরের গড়নে বিধাতার এইটুকুই কারসাজি (যে-আদর্শ ভারতীয় ভাস্কর্য ব্যতীত অন্য কোথাও বাস্তবীকৃত হয়নি) যে, তিনি একে ক্ষীণ-কটিনী করলেও তার বুকের দিকে নজর রেখেছেন। ইংরেজ মেয়েদের ভাগ্যে বিধাতার এতবড় প্রসাদ খুব বেশী ঘটে না; সুতরাং মেয়েটি যদি আপন সৌভাগ্য সম্বন্ধে যৎসামান্য সচেতন হয়ে থাকে, তাতে দোষ কী? পাৎলা রেশমের ওপর তার বুকের রেখাগুলো হলোই বা আঁকা! কোমরটি ঘিরে একটা চওড়া কালো ফিতে পেছনদিকে ফাঁস দেওয়া! বাঁ হাতের কব্জীর ওপর একটা পাথর-বসানো ব্রেসলেট্ ও গলায় একগাছি সরু প্রবালের মালা, যা ও-দেশে অভাবনীয় বলে বেশী করে চোখে পড়ে। তার চোখ,

মুখ, নাক, ঠোঁট, দাঁত প্রভৃতির বিশদ বিবরণ যদি আপনারা পেতে চান তো vide J. B.'s Anatomy of Inspiration, ছোট কবিতার বই, পাতা কুড়ি, দাম বেশী নয়, শিলিংখানেক। স্নতরাং সে-সবের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

আপাততঃ জলধিবরণের সমস্যা হলো, কী উপায়ে তিনি উক্ত মীনকন্যাটীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে হাত তিরিশ দূরে তাঁর ঈপ্সিতার কাছে গিয়ে পৌঁছতে হলে যেটুকু কোনুইয়ের কারসাজির দরকার হতো তা জলধিবরণের মত ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর মত মার্জিতরুচি লোকের পক্ষে কিউ-প্রথা প্রচলিত না হলে হয়তো জীবনে কোনোদিন থিয়েটার-সিনেমা বা লর্ড্‌সে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা হয়ে উঠতো না। এবং এসব কাজে সব চেয়ে বড় অন্তরায় তাঁর বিস্তৃত-সীম ইস্পানী টুপী, ও পীটারসনী পাইপ, যে-দুটীকে বাদ দিলে তাঁর সত্তার অনেকখানি বাকী থেকে যায়, এবং যে-দুটোকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণসত্ত কবি জে. বি.-র যত্রতত্র গতায়াত সম্ভবপর নয়। জলধিবরণ গত্যন্তর না দেখে উষ্ট্রমুখ হয়ে বক্তৃতা শোনবার ভান করে ঠিক সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন যেখানে হাল্‌কা কোয়াসা-মাখা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পাৎলা রেশমের ওপর আঁকাবাঁকা রেখাগুলো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

দু-পাশে রেলিং-দেওয়া একটা কাঠের সিঁড়ির ওপরে গজ-খানেক পরিসরের একটু চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে লম্বা কালো আলখাল্লা পরা প্রায়বৃদ্ধ একটি লোক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা

দিচ্ছেন। তাঁর পায়ের কাছে একটা কালো কাঠের ওপর বড় বড় শাদা অক্ষরে লেখা—Save the white Niggers. ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রের ওপরেই নাকি ঐ একই আকারের একটি নিগারল্যাণ্ড্ বিদ্যমান, বক্তা এই কথাটাই নানা উপায়ে শ্রোতাদের মগজের ভেতর প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছেন্। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শোনার পরই উপলব্ধি করা যায়, এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বিলেতের কর্মহীন মজুরদের সাহায্য করা। একটু পরে হঠাৎ কথকের সঙ্কেতে একদল লোক গোরাবাদ্যি বাজিয়ে জনতাকে সঙ্গীতে আহ্বান করলে—Oh, Save the white Niggers.

জলধিবরণ এই ধরণের কোনো একটা অঘটন ঘটবার অপেক্ষায় ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমগ্র জনতা সঙ্কীর্তনে আবিষ্ট হলো :

Oh, Save the white Niggers.
Give the poor beggars ইত্যাদি।

ক্ষুধার সুরে বাঁধা আড়ষ্ট কথাগুলো দেখতে দেখতে তালের ঘুর্ণিতে ঘুরপাক খেতে সুরু করলে। এবং সবাই পা ঠুকে, হাততালি দিয়ে, গা-ঝাড়া দিয়ে, মাথা নেড়ে গাইতে গাইতে একেবারে মেতে উঠলো। শ্বেতাঙ্গ কাফ্রীদের উদ্ধার করবার জন্যে যখন তাদেরই সমবেদনা-ব্যথিত নরনারী ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন, যা অনুমান করা যেতে পারে, একটি একটি ছেলে একটি একটি মেয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে সভা ছেড়ে সার্পেন্টাইনের

ধারে ধারে বনবাদাড় অভিমুখে ধাবিত হলো। কারণ শনিবারের নাচের পর রবিবারের দিবানিদ্রায় তাদের যৌবনে যে মন্দা পড়ে আসছিল, তা রুম্বার ঝাঁকুনিতে একেবারে গেঁজে উঠলো। জলধিবরণ কতকটা রুম্বার তালে তালে সরে সরে এসে হাজির হলেন এমন জায়গাটিতে যেখানে আসবার জন্যে তিনি গত আধ ঘণ্টা যাবৎ প্রয়াস পাচ্ছিলেন। মীনকন্যা ও তাঁর মাঝখানে যেটুকু ব্যবধান, তাতে পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নেদিষ্ঠ ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি প্লান ছকে নেবার সময় পেলেন।

আধময়লা চাঁদের আলোয় তেরচা-করে বসানো করমচা-রঙের টুপীর নীচে ঝুমকো ঝুমকো সোণালী চুল আর প্রবালের মালাটির যে সমন্বয় সেদিন জে. বি.-র চোখে ধরা দিয়েছিল, তারই কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর Anatomy of Inspiration-এর A posteriori-শীর্ষক কবিতা-চক্রে। প্রেমিকের প্রশ্বাসের মত গ্রীষ্মশেষের দু-এক ঝলক বেপথু, মন্দ বায়ু মেয়েটির মসৃণ গ্রীবায় তার সোণালী চুলগুলোকে কীভাবে থেকে থেকে স্থানচ্যুত করছিল, সে-দৃশ্য জলধিবরণ সেদিন অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করেছিলেন, এবং তাতেই ছিল তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রধান প্রেরণা। তিনি ঐ প্রেরণাটিকে আরো অধিক মূর্তরূপে পাবার জন্যে আস্তে আস্তে মেয়েটির খুব কাছে সরে এলেন। এত কাছে যে তাঁকে মুখ থেকে পীটারসনী পাইপটি নামাতে হলো, নচেৎ তার আগুনে মেয়েটির চূর্ণকুন্তলের কয়েক-গাছি পুড়ে ছাই হতো।

এতক্ষণ পরে হাইড্-পার্কের মলয়-পবন যে-কাজে ব্যাপৃত ছিল, জলধিবরণ ঠিক সেই কাজটিরই ভার পেলেন। অর্থাৎ তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মীনকন্যাটির কুন্তল-গুচ্ছ মুহুর্মুহু স্থানচ্যুত হতে লাগলো, এবং সেও বারে বারে হাত দিয়ে তার পেছনদিককার চুলগুলোকে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। বারংবার এমত ঘটনা ঘটায় জলধিবরণকে বাধ্য হয়ে একবার বলতে হলো—Oh, pardon. মেয়েটিও তার প্যান্থারের মত সাবলীল গ্রীবা হেলিয়ে পেছন ফিরে উত্তর দিলে—Oh, it's all right. কবি জে. বি.-র সঙ্গে তাঁর ইন্‌স্‌পিরেশনের এই প্রথম চোখোচোখি হলো, এবং ভিড়ের প্রসাদে তাঁদের মুখ দস্তুরমত কাছাকাছি এসে পড়লো। ক্রমে পেছনের লোকের অগ্রগতিতে তিনি মীনকন্যাটির একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। এইখানেই যদি তিনি সাধারণ বাঙ্গালী কবির মত দু-চোখ ভরে তার রূপ-সুধা পান করে, তার স্পর্শ-সুখ অঙ্গে বহন করে কণ্টকিত দেহে তাঁর রুম্‌সে ফিরে আসতেন, তাহলে বাংলাভাষায় এককানা মহাকাব্য-জন্মলাভ করতে পারতো। কিন্তু যেহেতু তিনি Céline-এর "রাত্রি-পারের যাত্রা"-র মত একখানা উল্‌ত্রা-রেআলিস্ত্‌ মহাভারতের মালমসলা সংগ্রহ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁকে বাধ্য হয়ে বেশ একটু অসমসাহসিকতা করতে হলো। এবং বিধির বিধানে এইখানেই কিশোরী রাত্রিতেই তাঁর নৈশ অভিযানের উপসংহার ঘটলো।

জলধিবরণ এই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটির অত কাছে দাঁড়িয়ে

বেশীক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারলেন না। মিনিট পাঁচেক উস্-খুস্ করে এবং বার তিনেক "Oh pardon" বলে অবশেষে তিনি বেপরোয়াভাবে তাঁর ডান হাতটিকে আস্তে আস্তে মেয়েটির বাঁ হাতের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন। গীতবাদ্যের সঙ্গে এ-কাজটি বেশ ক্ষিপ্র গতিতেই সম্পন্ন হলো। এবং তিনি যেরূপ আশা করেছিলেন, মীনকন্যাটি পেছন ফিরে তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হাসলে। ঠিক এই সময়ে দেখা গেল, জলধিবরণের প্রেরণাটি ভিড়ের ভেতর থেকে তার ডান হাতটিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। সুতরাং তিনি নিজে একটু সরে গিয়ে তাকে তাঁর দিকে একেবারে মুখোমুখিভাবে ফিরে দাঁড়াবার সুযোগ দিলেন। অর্থাৎ এইবার তাঁরা দুটিতে আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে বাইরে আসবেন। এইখানেই জে. বি.-র আশায় ছাই পড়লো। তাঁর দিকে ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি তাঁর সামনে একটি কালোরঙের তালা-দেওয়া টিনের গোল বাক্স তুলে ধরে একটা ঝাঁকানি দিলে। তার ভেতরে যে নানা আকারের অর্থ-খণ্ড জমা হয়েছে, তা ঝাঁকানির শব্দেই স্পষ্ট বোঝা গেল। এবং বাক্সটির ওপর জলজ্বলে শাদা অক্ষরে লেখা "Save the white Niggers" মীনকন্যার এমত আশঙ্কাতীত ব্যবহারের তাৎপর্য জলধিবরণকে এক নিমেষেই বুঝিয়ে দিলে।

জলধিবরণ যন্ত্রচালিতবৎ তাঁর পকেটে তাঁর শেষ সম্বল হাফ্-এ-ক্রাউনটির কোর-কাটা ধারে দু-একবার আঙুল বুলিয়ে সেটিকে বাক্সের ওপর লম্বা সরু গর্তটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে

দিলেন। ঝনাৎ করে একটা নীরেট শব্দ হলো। এবং শ্বেতাঙ্গ কাফ্রীদের সাহায্যকল্পে এক বিখ্যাত বাঙ্গালী লেখকের ইংরেজী ভাষায় লেখা "রাত্রিপারের যাত্রা"য়-পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।

কলিকাতা,
২০শে কাতিক, ১৩৪৮

লেস ও রেশম

সেদিন রবিবার। কিন্তু শর্বরীভূষণকে কোনো বিশেষ কারণে ব্রাহ্ম মুহূর্তেই শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরতে হয়েছিল। এবং সে যেমন আশা করেছিল, বেল্‌সাইজ্ পার্ক্ থেকে উইম্ব্‌ল্‌ডন্-এ গিয়ে সকাল আটটার মধ্যেই, অর্থাৎ তার ল্যাণ্ড্‌লেডী উঠে গির্জেয় কমিউনিয়ন্-এ যাবার আগেই বাড়ী ফিরতে সমর্থ হবে, তা হয়ে উঠলো না। পথে আসতে আসতেই সে শুনতে পেলে, দূরের পুরোনো গির্জের ঘড়িটা যেন হাই তুলে আড়া-মোড়া ভাঙতে ভাঙতে একটি একটি করে নটা বাজিয়ে দিলে। মড্ যদি বাহাদুরী করে চা আর সসেজ না করতে যেত, তা হলে এতটা দেরী হতো না। মিসেস্ কীটিং-এর কাছে তাকে দস্তুরমত অপদস্থ হতে হয়েছে, একথা শুনলে সে শুধু হাসবে বৈ ত নয়! তার ল্যাণ্ড্‌লেডী যে তার মাসী-পিসী নয়, সেকথা না জানে কে?

কিন্তু মড্ একথা একেবারেই বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, ইংরেজ ছাত্রদের যে-ব্যবহারকে সাধারণতঃ ল্যাণ্ডলেডীরা sowing wild oats বলে মুচকী হাসিতে উড়িয়ে দেয়, ভারতীয় ছাত্রদের বেলায় সে-ব্যবহারকে তারা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে থাকে। এবং মিসেস কীটিং-এর জিহ্বা এবিষয়ে তাঁর সগোত্রীয়-উদ্ভাবিত vermin powder-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কোনোপ্রকার দুর্নীতিকে তিনি যে vermin-এর মত মনে করেন, তা নিয়ে যখন-তখন নিজের উদ্বাহ্-লব্ধ নামটির প্রতি ইঙ্গিত করা তাঁর রেওয়াজ।

শর্বরীভূষণ যখন ত্রস্তপদে আপন ঘরে এসে ঢুকলো তার আগেই মিসেস্ কীটিং তার জিনিষপত্র ঝাড়ামোছা প্রায় শেষ করে এনেছেন। তার দিকে না তাকিয়েই তিনি একটু যেন শ্লেষের সুরে বললেন—An early bird, eh ? শর্বরীভূষণ একটা চলনসই গোছের গুড্মর্ণিং বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ পড়লো জানলার ধারে নিজের বিছানার ওপর। পরিপাটিরূপে আইডারডাউনটি গোছানো, তার ওপর বেড-কভারটি নিখুঁতভাবে ঢাকা দেওয়া, এবং তার ওপরে! শর্বরীভূষণ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দস্তুরমত সন্দিহান হলো। সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে, না সত্যি ? মডের ছেলেমানুষী ও যথেচ্ছাচারিতায় তার মন বিষিয়ে উঠলো। নীল ফুলকাটা বেড্-কভারটার ওপর একটু বেশী করে চোখে পড়ে এমনভাবে মেলে রাখা ঐ জিনিষটা! ক্রীম রঙের রেশমী কাপড়, তার ধারে ধারে লেস বসানো!

অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করেই কাপড়টা চাপা দেবার অভিপ্রায়ে শর্বরীভূষণ তাড়াতাড়ি তার হ্যাট্ ও কোট সমেত তার ওপর বসে পড়লো।

মিসেস্ কীটিং আগুনের ধারের পেতলের ফেণ্ডারগুলোকে মেট্যাল-পলিশ্ দিয়ে ঘসে ঘসে চক্‌চকে করতে লাগলেন, এবং শর্বরীভূষণ বসে বসে ভাবতে লাগলো, কী ভাবে কোনো একটা আলোচনা সুরু করা চলতে পারে। গতকালের চেল্‌সীর ফুটবল ম্যাচ, আর্চ্‌বিশপ্ অফ্ ক্যাণ্টারবারীর হাইকিং সম্বন্ধে মতামত, বিশপ্ অফ্ লাণ্ডনের খ্রীষ্টধর্ম ও জাতি-সমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা, সেণ্ট্ পলের ডীন্-এর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান, কুইন্‌স্-হলে এক মিডিয়ম কর্তৃক পরপারের সচিত্র বিবরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি, যা সে সেদিন ট্রেনে রবিবারের ছবিওয়ালা কাগজগুলোয় পড়তে পড়তে আসছিল, তাদের সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গেই মিসেস্ কীটিং-এর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই নিতান্ত সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—Hm-hm, is that so? বিশেষ কোনো কারণে তিনি যে শর্বরীভূষণের প্রতি বিরূপ হয়েছেন, তা তাঁর অস্বাভাবিক তূষ্ণীভাবের চেয়ে অকাট্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। শর্বরীভূষণের মনে এই সন্দেহ যতই প্রকটতর হয়ে উঠতে লাগলো ততই তার নিজের বাক্‌পটুতার ওপর আস্থা কমে আসতে লাগলো, এবং তার পরিষ্কার অক্স্‌ফোর্ডী ইংরেজী ক্রমে ফার্স্ট বুকের কোঠায় গিয়ে ঠেকলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস কীটিং বেশ একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্বগতোক্তি করলেন—Ah well, another Sunday come. শর্বরীভূষণের মনে হলো, কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে। তার শনিবারের রাতগুলোর প্রতি ঠেস দিয়েই যেন রবিবারের আগমনবার্তা ঘোষণা করা হলো। একটু মন-রাখা শুকনো হাসি হেসে সে প্রস্তাব করলে, আজ সন্ধ্যায় মিসেস্ কীটিংকে নিয়ে সে সিনেমায় যেতে চায়। অন্য-অন্য বারের মত এবার সিনেমা যাওয়া সম্বন্ধে মিসেস্ কীটিং-এর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। পবিত্র ভট্টারকবারে যে তিনি কোনোরূপ আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেন না, একথা শর্বরীভূষণের জানা থাকলেও তার মনে হলো, তিনি শুধু Lord's day-র ছুতো করে তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। একটু অপ্রতিভ হয়ে শর্বরীভূষণ যে নূতন প্রস্তাব করলে, তা তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য। সে কি মিসেস্ কীটিংএর সঙ্গে এগারোটার সার্ভিসে গির্জেয় যেতে পারে? এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবেও তাঁর কোনো উৎসাহ প্রকাশ পেল না। নিতান্ত সাধারণভাবে উত্তর এলো, ডিনারের জোগাড় করা হয়নি এখনো, আজ গির্জেয় যাবার সময় নেই। তিনি যে শর্বরীভূষণের ওপর রীতিমত চটেছেন, এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে? অনেক চেষ্টা করেও সে তার মুখের ওপর হাসির শেষ রেশটুকু জাগিয়ে রাখতে পারলে না। সামনের দেওয়াল-আয়নায় দেখতে পেলে, তার কানদুটো করমচার মত রাঙা হয়ে উঠেছে, এবং

অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ার কতকগুলো এলোমেলো, অসংযত রেখায় তার মুখখানাকে নিতান্ত করুণ করে তুলেছে।

তত্রাচ শর্বরীভূষণ দমবার পাত্র নয়। সে এবার এমন এক প্রস্তাব করলে যা সে স্বদেশে দু-একবার ছাড়া কখনো কার্যে পরিণত করেনি। মিসেস্ কীটিং-এর সঙ্গে সে বাজারে যেতে পারে কী? বৃদ্ধা বাজারে যাবার সময়ে তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনকে সঙ্গে নেবার জন্যে প্রায়ই সাধাধাধি করেন, সে তা লক্ষ্য করেছে। গত শুক্রবার বোনটিও ব্রাইটনে উইক্-এণ্ড্ কাটাতে গেছে। সুতরাং শর্বরীভূষণের ক্ষীণ আশা হলো, তার সঙ্গ এমন অযাচিত-ভাবে লাভ করতে পারলে নিশ্চয়ই তা প্রত্যাখান করা মিসেস্ কীটিং-এর পক্ষে সম্ভব নয়। বাজার আর কী? কিছু আনাজ-তরকারী আর মাংস, বড়জোর গ্রোসারের দোকান থেকে চিনিটা, ময়দাটা বা এক প্যাকেট "সুয়েট্," চামড়ার ব্যাগটায় বিশেষ অশোভন দেখায় না, তাছাড়া মিনিট পাঁচেকের পথ। কেই বা লক্ষ্য করছে? কিন্তু তার এ আশাতেও ছাই পড়লো। উত্তর এলো, আজ বাজারে যেতে হবে না, আজকের বাজার কালই করা হয়েছে। আবার একটু অপ্রতিভ হয়ে শুধু "Ah well" বলে শর্বরীভূষণ চুপ করে রইলো।

মিসেস্ কীটিং আপন মনে কার্পেট-ক্লীনার দিয়ে ঘরের গালচে-খানাকে ঘাস কাটার মত ঘুরে ফিরে পরিষ্কার করতে লাগলেন। প্রতি রবিবারেই যখন তাঁর সঙ্গে শর্বরীভূষণের দেখা হয়, তখন তাঁর নানা অবান্তর প্রসঙ্গে বেচারাকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়।

অথচ আজ সে এতবার চেষ্টা করেও তাঁর মুখ থেকে এক সঙ্গে ছুটোর বেশী কথা বার করতে পারলে না। এ মৌনব্রতের কারণ কি তার জানতে বাকী আছে? প্রতি শনিবারই যখন এতদিন ধরে উইম্বল্‌ডনে কাটিয়ে এসেছে, তখন এ শনিবারটাই বা সে তার রুমস্‌-এ কাটাতে গেল কেন? মডের ঝোঁক! একবার যা তার মাথায় ঢুকবে, তা কাজে না করে সে কিছুতেই ছাড়বে না। তাদের সম্পর্ক যদি সে নিজের মা, ভাই-বোনের কাছেই গোপন না করে থাকে তো কোথাকার কে এক শুকনো বুড়ী ল্যাণ্ড্‌লেডীর কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করতে যাবে কেন? ওরকম করলে নাকি তাদের ছু-জনকেই কঠিন স্নায়বিক রোগে ভুগতে হবে; একবার মানুষের সত্তা ছু-টুকরো হয়ে গেলে তাকে জোড়া দেওয়া নাকি all the king's men and horses-এর সাধ্য নয়। স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে সে নীচ, ঘৃণ্য মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে রাজী নয়। কিন্তু তাই বলে অমন অশ্লীল হবার কী প্রয়োজন ছিল? তাদের কথা যারা জানে, তাদের কাছ থেকে লুকোবার পক্ষপাতী সেও নয়। কিন্তু সবার কাছে অমন ঢাক পিটিয়ে বেড়াবার দরকার কী? বিশেষতঃ যীশুপ্রাণ মিসেস্‌ কীটিং-এর বাড়ীতে রাত কাটিয়ে গিয়ে যে বাহাদুরী করে গেল, তার ওপর বাড়তি ওটুকু কি না করলেই চলতো না? শর্বরীভূষণ মনে মনে ঠিক করলে, আজই বিকেলে মডের সঙ্গে এধরণের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে নেবে।

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ বসে থেকে অস্বাভাবিক নীরবতায়

শর্বরীভূষণ অস্থির হয়ে উঠলো। সে বেশ বুঝতে পারলে, আজ সারাদিন এইভাবে কাটবে। কাল সকালে তার টেবিলের ওপর খামে-করা চিঠিতে সে জানতে পারবে, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে দু-একবার এরকম ঘটনা সে আগেই প্রত্যক্ষ করেছে। লন্দনে মনের মত বাড়ী খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব। ভারতীয় দেখলেই ল্যাণ্ডলেডীরা নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। মিসেস্ কীটিং-এর আর যাই দোষ থাক ওসব প্রেজুডিস নেই। এমন কি দু-একজন দুস্থ ভারতীয় ছাত্রকে তিনি মাসের পর মাস বিনা খরচে নিজের বাড়ীতে রেখেছেন। একটা কেলেঙ্কারী করে তাঁর বাড়ী ছাড়তে হলে লজ্জায় সে মরে যাবে। মন্তের বেহায়াপনায় সে ভারী বিরক্তি বোধ করতে লাগলো। ঐ জয়পতাকাটিকে না রেখে গেলে এমন কি তার হার হতো?

খানিকক্ষণ ভেবে শর্বরীভূষণ আর এক প্রস্তাব করলে। এটি তার হাতের রঙের তুরুফ্। এটিও যদি কার্যকর না হতে পারে তাহলে কাল থেকেই একটা বাড়ীর খোঁজে বেরতে হবে। কথাটা কীভাবে তোলা যায়, সেও একটা সমস্যার মধ্যে। মিসেস্ কীটিং-এর অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাঁর বুর্জোয়া মনোভাব তার জানা আছে। তাঁর যে টাকার প্রয়োজন, এরকম অনুমান তিনি ব্যক্তিগত অপমান বলেই মনে করে থাকেন। কথাটা একটু ঘুরিয়ে সে বললে—ওহো, মিসেস্

কীটিং, আমার এক ভারী মুস্কিল হয়েছে। জানেন, ফরাসীরা যাকে বলে embarras de richesse, ঠিক তাই। কাল সকালে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখি, বাবা অনেকগুলো টাকা পাঠিয়েছেন। জানেনই তো আমি যেরকম খরচে মানুষ। তাই ভাবছিলাম, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো সামনের চার সপ্তাহের টাকাটা আগাম দিয়ে রাখি। কী বলেন?—মিসেস্ কীটিং উক্ত প্রস্তাবে যে বিশেষ উদ্বেল হলেন তা নয়। তবে আগাম নিতে তার আপত্তি নেই, জানালেন। শর্বরীভূষণ আশ্বস্ত হলো, বুড়ী তাব ওপর নিতান্ত বিরূপ হলেও তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে না। হয়তো বৃদ্ধা নিজেই আড়ালে তাকে জানিয়ে দেবেন, তাঁর বাড়ীতে এসব অনাচার ভবিষ্যতে যেন না ঘটে। তার পর ক্রমে কথাটা চাপা পড়ে যাবে। এবং এর মধ্যে ধীরে সুস্থে একটা অন্য বাড়ী খুঁজে নিলেই চলবে। টাকায় কী না করতে পারে? দেখ না, এতক্ষণ পরে বুড়ীর মুখ থেকে তেলো নামলো! যাক্, এযাত্রা বাঁচা গেল।

শর্বরীভূষণের ব্যাঙ্কে পনেরো পাউণ্ড আলাদা করা ছিল, সামনের সপ্তাহে মডের সঙ্গে পারীধামে উইক্-এণ্ড্ করতে যাবে বলে। বাড়ীর টাকা আসবার এখনো দেরী। পারী-যাত্রাটা দু-এক সপ্তাহ পেছিয়ে না দিয়ে উপায় কী? মড্ রাগ করবে। তার কাছে অসুস্থতার ছুতো করলেই চলবে। শরীরটা তার ভালো নেই, ব্যস্! মডের সঙ্গে পারীর অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানো, তার পর কার্তিয়ে লার্ত্যার একটা পুরোনো রোমান্তিক

হোটেলে রাত জেগে তারা দু-জনে ভিয়ঁ-র গ্রঁ। তেস্তামাঁ পড়বে, সেই পুরোনোকালের মেত্রেস্‌দের বর্ণনায় ভরা গ্রঁ। তেস্তামাঁ! কতদিন ধরে তারা এমন ছুটো রাতের স্বপ্ন দেখে এসেছে। কালই তারা চেয়ারিং ক্রসের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে ভিয়ঁ-র একখানা বই কিনে এনেছে। শর্বরীভূষণ তখনই পড়তে যাচ্ছিল, মড্‌ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—No darling, not until we find the very place where Villon used to make love to his ladies. শর্বরীভূষণ ক্ষুণ্ণ মনে বুক পকেট থেকে চেক্‌-বই বার করে মিসেস্‌ কীটিং-এর নামে সাড়ে দশ গিনীর একখানা চেক্‌ লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করলে।

কোমরের এপ্রনে হাত মুছে মিসেস্‌ কীটিং চেক্‌খানা ছুটো আঙুল দিয়ে ধরে তাঁর ব্যাগে রেখে দিলেন। শর্বরীভূষণ লক্ষ্য করলে, চেক্‌খানা হাতে পেয়ে তাঁর মুখের গুমোট ভাবটা একেবারে কেটে গেছে। কী বস্তুবাদী এরা! ধর্ম, নৈতিকতা শোভন-অশোভন যা কিছু সব টাকার ভরীতে ওজন-করা। যাই হোক্‌, বেচারী বুড়ীর নেহাৎ টাকার দরকার পড়েছিল, মুদীর দোকানে অনেক বাকী পড়েছে নিশ্চয়। তা না হলে শুধু টাকা আগাম নিয়ে এতবড় একটা ছুর্নৈতিক ব্যাপারকে মার্জনা করতে পারে? মুখে কিছু বলতো না। কিন্তু বিছানার ওপর লেস-ওয়ালা রেশমের কাপড়টাকে যেভাবে ছড়িয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল, তাতে সেই কাপড়টাই তো চিৎকার করে ল্যাণ্ড্‌-লেডীর

মনের কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়েছে। যাক্, এযাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল।

মিসেস্ কীটিং ঘর সাফ করে তাঁর কার্পেট্-ক্লীনারটা একপাশে সরিয়ে রেখে কী একটা জিনিষ খুঁজতে লাগলেন। টেবিল, আলমারী, সোফা, কোথাও নেই সেটা। তন্ন-তন্ন করে দু-বার খুঁজলেন। তারপর শর্বরীভূষণের কাছে এসে বললেন—Do you mind getting up a little ?

কেন, কী হয়েছে ?

এই যে বিছানার ওপরেই ছিল সেটা !

শর্বরীভূষণ "কী" জিজ্ঞেস করবার আগেই মিসেস্ কীটিং তার ওভার-কোটের তলায় একপাশ থেকে বেরিয়ে-থাকা একটুকরো লেস ধরে বললেন—এই যে, আপনি দিব্যি চেপে বসে পড়েছেন তার ওপর, please get up.

এখন আর না উঠে উপায় কী ? শর্বরীভূষণ কান দুটো রাঙা করে উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস্ কীটিং-এর সগোত্রীয়-উদ্ভাবিত vermin powder প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সার্মন শোনবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হলো।

মিসেস্ কীটিং লেস-দেওয়া রেশমের কাপড়টা বিছানার ওপর থেকে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে আশাতীত স্বগতোক্তি করলেন—ইস্তিরিটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর সেটাকে নিয়ে সটান জানলার কাছে গিয়ে দু-পাশের হুকের ওপর ঝুলিয়ে দিলেন।

বুকে হাত চেপে বিছানার ওপর বসে পড়ে শর্বরীভূষণ আবিষ্কার করলে, ওটা মিসেস্ কীটিং-এর সংসারে সদ্য-কেনা হাল-ফ্যাশানের বাহারে পর্দা ছাড়া আর কিছু নয়।

কলিকাতা,
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

প্রথম প্রেম

একদিন অম্বিকাচরণের বাড়ী এসে তার বন্ধু রমেন বোস খবর দিলে, লন্ডনে নাকি বত্রিশ শিলিং-এ তোফা স্যুট পাওয়া যায়, তার ওপর আরো পাঁচ শিলিং খরচ করলে মেলে এক জোড়া প্লাস্-ফর্স্।

যাঃ, বাজে চাল মারিস্‌নি।

মাইরী, আমার এই ডান্‌হিলের আগুন ছুঁয়ে বলচি।

বেশ, করিয়ে নিয়ে দেখাস্।

আজ মাপ দিতে যাবো ভাবচি, চল্ না আমার সঙ্গে।

সামনে একজামিন, হাতে পয়সা নেই, তুই একাই যা।

যাবি আর আসবি, বিকেলের দিকে বেরুনো যাবে। এখান থেকে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা, বাসে চড়ে মাথায় খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আসবি। স্যুট না হয় নাই করালি, স্রেফ বেড়িয়ে আসবি।

এর ওপর রমেন দোকানের একটি মেয়ের এমন বর্ণনা দিলে যে, পরীক্ষা-ক্লিষ্ট, রুম্‌স্‌-নির্বাসী অম্বিকাচরণের পক্ষে কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

হ্যাম্প্‌স্টেড্‌ থেকে টিউবে করে টটেনম্‌কর্ট্‌ রোডে এসে তার পর দোতালা বাসে চড়ে শেফার্ডস্‌ বুশ্‌-এ দুই বন্ধুতে গিয়ে নামলো। তারপর একজায়গায় এসে রমেন একটু দূরে একটা দোকানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—এবার বিশ্বাস হচ্ছে, Three piece Suit for 32/-, 5/- extra for plus-fours ? ফার্ষ্ট্‌ ক্লাস কাপড়। পশ্‌ পাড়াতে হলে ওর দাম অন্ততঃ চার গিনী নিত।

বলতে বলতে তারা দোকানের ভেতর ঢুকলো।

দোরের কাছে একজন কাঁচা-পাকা চুল-ওয়ালা লোক ওয়েস্ট-কোট্‌ গায়ে দিয়ে গলায় গজ-ফিতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করছিল। ওদের অমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি দাঁত-খোঁটা শালকটাকে পকেটে রেখে বেশ একটু আড়ম্বর করে অভিবাদন জানালে।

দোকানে ঢুকে অম্বিকাচরণ যে-রকম আশা করছিল তার চেয়ে ঢের-বেশী চমৎকৃত হলো। ঘুপটি অন্ধকার কোণে কাচ দিয়ে ঘেরা একটা কাঠের মঞ্চের ওপর বসে কী একখানা খাতা লিখছে মেয়েটি। মাথায় একরাশ সোণালী চুল পেছন দিকে খোঁপা করে বাঁধা, একটু লম্বা ধরণের মুখ, ঠোঁটের কোরক-দুটি অভিমানে ভরা। অম্বিকাচরণকে সব চেয়ে আকর্ষণ করলো তার

গাঢ় নীল চোখ এবং একটু ওপর দিকে তোলা, দলরেস্ দেল্ রিও ধরণের চোখের পাতা। রমেন বোস যতক্ষণ দোকানের মালিককে নানা কাপড় দেখানোতে ব্যস্ত রাখলে ততক্ষণ অম্বিকাচরণ মেয়েটির রূপ দু-চোখ ভরে দেখেও তৃপ্ত হতে পারলে না।

খানিকক্ষণ এটা ওটা সেটা দেখার পর রমেন বোস হালকা ব্রাউন রঙের একটা কাপড় পছন্দ করে অম্বিকাচরণকে তার মতামত জিজ্ঞেস করলে। সামনেই সামার আসচে, এ শেড্‌টা ভালোই হবে, না? অম্বিকাচরণ অনুমোদন করবার আগেই ওয়েস্ট-কোট পরা লোকটি কলের মত আউড়ে গেল—The very shade you want, Sir, you'll find it extremely pleasant when the Sun begins to show itself more regularly. What d'you say Miss, eh ? শেষ প্রশ্নটা কেন যে মেয়েটিকে করা হয়া হলো তার সম্যক্ তাৎপর্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হলেও রমেন ও অম্বিকাচরণ দু-জনেই পৃষ্ট ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরালে। মেয়েটি শুধু "I should think so" বলে চুপ করে রইলো। ভারী লাজুক মেয়েটি, হয়তো ভদ্রঘরের, দারিদ্র্যের পীড়নে এই গরীব পাড়ায় এঁদো, শস্তা দর্জির দোকানে খাতা লেখবার কাজ করছে। অম্বিকাচরণ তার জন্যে মনে মনে কেমন একটু সমবেদনা অনুভব করলে।

ওয়েস্ট-কোট পরা লোকটি হাতের কাপড়টা কাউন্টারের ওপর মেলে রেখে গলার গজ-ফিতেটার এক দিক ধরে টান দিতেই

সেটা সাপের মত এঁকেবেঁকে মাটিতে এসে পড়লো। তারপর মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বললে—Take down the measurements, will you please, Miss? ছাতি এত ইঞ্চি, কোমর, গলা, একে একে জ্যাকেটের সব মাপগুলো লেখা হলো। এবার পেণ্টুলেন। বেড় এত ইঞ্চি, পাছা এত ইঞ্চি, চওড়া এত ইঞ্চি, লম্বা এত ইঞ্চি, দর্জি রমেনের উরুমূল থেকে পায়ের গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত গজ-ফিতেটা টেনে ধরলে। এতক্ষণ মেয়েটি মাপ নেওয়া দেখছিল, এইবার যেন একটু সলজ্জভাবে খাতার ওপর তার ঐ ডাগর ডাগর চোখ দুটোকে নামিয়ে নিলে। এইবার প্লাস্-ফর্স্। দর্জি রমেনকে তার পেণ্টুলেনটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরতে অনুরোধ করলে। সিল্কের মোজা আর সাস্পেণ্ডারের মাঝখানে রমেনের অনাবৃত পায়ের খানিকটা দেখা গেল। অম্বিকাচরণ লক্ষ্য করলে, মেয়েটির চোখ আগের মতই খাতার ওপরে, লজ্জায় সে যেন একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

এর পর কিছু আগাম টাকা দিয়ে রমেন ও অম্বিকাচরণ দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, এবং ওয়েস্ট্-কোট পরা লোকটা আবার দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কলমের মত করে কাটা একটা পালক দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলো।

দোতলা বাসের মাথায় বসে অম্বিকাচরণের মনে হলো তার চোখে সমস্ত লন্দন শহরটা আগাগোড়া বদলে গেছে। এপ্রিলের পড়ন্ত রোদ মাখা গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি কেন্সিংটন্ গার্ডন্স্-এর নব-জাগরিত পত্রপল্লবের ওপর মুঠো মুঠো সোণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

রমেন বোস তার হাঁটুটা একটু টিপে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলি, চলনসই? আমার কোনো ইণ্টরেস্ট নেই, এখন it's up to you.—অম্বিকাচরণ স্বধু উত্তর দিলে—I feel rather sorry for her slaving for that despicable Jew. যা থেকে রমেন বোস অনুমান করলে, অম্বিকাচরণ সত্যিই প্রেমে পড়েছে।

এবং অম্বিকাচরণ যথার্থই প্রেমে পড়লো।

বাসায় ফিরে ঠাণ্ডার অছিলায় সে তার ল্যাণ্ডলেডীকে তার ঘরে আগুন জ্বালাতে বললে, এবং ড্রেসিং-গাউন পরে Pre-Raphaelite-দের কবিতার বই নিয়ে বসলো আগুনের ধারে। Harris-এর Criminal Law আর Morgan-এর Constitutional Law-র নোট সেই যে বুক-কেস্-বন্দী হলো, তার পর আর তারা বাইরের আলো-বাতাসের মুখদর্শন করতে পেলে না।

পরীক্ষার মাত্র পনেরো দিন বাকী। অম্বিকাচরণ একটা আসন্ন বিপদ থেকে আপাততঃ মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। পরের দিন টাকা জমা দেবার কথা, কিন্তু তা তার ব্যাঙ্কেই জমা রইলো, এবং সে হিসেব করে দেখলে, তার একাউণ্টে আছে ঠিক দু-পাউণ্ড। সুতরাং বত্রিস্ প্লাস্ পাঁচ, সাঁয়ত্রিশে একটা স্যুট এবং একজোড়া প্লাস্-ফর্স্ হয়ে যাবে। পরীক্ষা দিলে যে এক গিনী চলে যেত, এবং তা হলে সে যে আর শেফার্ড্স্ বুশ্-এ যেতে পারতো না, সে-কথা মনে করে স্বেচ্ছায় পরীক্ষা না দেওয়ার জন্যে সে বিবেকের তাড়না থেকে নিষ্কৃতি পেলে। এবং সারাদিন

হেলাফেলায় হ্যাম্প্‌ষ্টেড্‌ হীথের আঁতে-কোণে ঘুরে বেড়িয়ে পুনঃপুনঃ স্বগতোক্তি করতে লাগলো—To be in England, now that April's h e r e !

তিন দিন পরে রমেনের স্যুট আনবার কথা। অম্বিকাচরণ হীথ পার হয়ে হাই গেটে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো এবং স্যুট আনবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে রমেন বোসকে রীতিমত আশ্চর্য করে দিলে। তার অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ-রূপে সে একটা পঙ্গু যুক্তি দিলে—এ টার্ম্‌টায় পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠলো না ভাই, কিস্‌সু তৈরী হয়নি। একটা ক্লাস না পেলে বাড়ীতে লিখবো কী? তাছাড়া আবার এই তো "ভ্যাকে"র পরেই পরীক্ষা, দেখে নিস্‌ ভালো ফল হবে। তা ভাবচি কি জানিস, হাতে ঠিক দু-পাউণ্ড্‌ আছে, একটা স্যুট করিয়ে নিলে হয়, অমন শস্তা, সামারে পরবার কিছু নেই। চল্‌ আমাকেও একটা কাপড় পছন্দ করে দিবি।

রমেনের স্যুট তৈরী হয়ে ছিল। দোকানে ঢোকামাত্রই ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটা দাঁত-খোঁটা পালকটাকে পকেটে পুরে লালা-সিক্ত ভদ্রতার সঙ্গে রমেনকে তা ট্রাই করতে বললে। এবং রমেন পর্দার ওপাশে গিয়ে নতুন স্যুট পরে বেরিয়ে এলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে—Look Miss, hau d'ye loike this gennlem'n in this, eh? অম্বিকাচরণের মনে হলো, যেন রমেনকে এই নতুন স্যুটে মেয়েটির সত্যিই ভালো লেগেছে, কারণ এবার তার বিষাদ-ভরা ডাগর ডাগর চোখে কেমন যেন

একটু কৌতুকের ছায়া পড়লো, যেন পরিচয় থাকলে একটা ঠাট্টার কথাও বলতে পারতো। রমেনের দিকে তাকিয়ে বললে—I rather like the gentleman in that shade you know, and hasn't it fitted him just nicely ?

দাম চুকিয়ে দিয়ে রমেন তার স্যুটের প্যাকেট্‌টা বগলে চেপে ধরে অক্স্‌ফোর্দী তির্যক ভঙ্গীতে পাইপ ধরালে, তারপর অম্বিকাচরণকে একটা good turn করবার জন্যে দোকানের মালিককে বললে—How about making a similar thing for my friend ? And would this young lady choose the proper shade for him ? মেয়েটি আবার যেন একটু সঙ্কোচভরে সামনে-মেলা খাতার ওপর চোখ নামিয়ে নিলে। ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটি একরাশ কাপড় এনে তার সামনে ধরে দিয়ে বললে—Well Miss, 'ere ye are, do the choosin' for this gennlem'n, will yuh please ? মেয়েটি সলজ্জভাবে অম্বিকাচরণের দিকে তাকিয়ে বললে—You are a little fairer than your pal, aren't you ? I think this lighter shade would do beautifully for you. অম্বিকাচরণের মনে হলো, fairer কথাটার ওপর যেন একটু জোর পড়লো। হাঁা, রমেনের চেয়ে সে ফর্সা বৈ কি ! তার কল্পনার চক্ষে ফুটে উঠলো তার নিজের মূর্তি, নতুন স্যুটটা পরে সে পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছে ঐ মেয়েটি। তারপর এদিকে একটু যাওয়া-আসা করলেই তার

সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া যাবে। তারপর সামনেই সামার ভেকেশন্‌স্‌, রবিবার-রবিবার তাকে নিয়ে গ্রামে বা সমুদ্রের ধারে র‍্যাম্বলে বেরুনো যাবে। তারপর সবুজ, ছায়াভরা চেস্ট্‌নাট্‌-এর তলায় বসে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুদূর তরঙ্গায়মান মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা, কখনো একটা ডেজী দিয়ে তার মুখের ওপর সুড়সুড়ি দেওয়া!

ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটি তার গলায় ঝোলানো গজ-ফিতের একদিক ধরে টানতেই সেটা আগের মতই সর্পিল ভঙ্গীতে মাটিতে এসে পড়লো।—Will you please take down the measurements, Miss?—মেয়েটি খাতার ওপর চোখ নামিয়ে মাপ টুকতে লাগলো—ছাতি এত ইঞ্চি, গলা এত, কোমর এত··· দর্জি এবার অম্বিকাচরণের উরুমূল থেকে পা পর্যন্ত ফিতেটাকে টেনে ধরলো, লম্বা এত ইঞ্চি। অম্বিকাচরণের মনে হলো, মেয়েটি যেন সন্তর্পণে খাতা থেকে চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করলে। পেণ্ট্‌লেনের পায়ের মাপে মানুষের দৈর্ঘ্য অনুমান করা যায় বৈ কি! মেয়েটি হয়তো আগে বিশ্বাস করতো না, সে রমেনের চেয়ে অনেক, অনেক ঢ্যাঙা; রমেন অবশ্য ছিপ্‌ছিপে, কিন্তু মেয়েরা তো বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার পুরুষের কাছেই বেশীর ভাগ আত্মসমর্পণ করে। প্লাস্‌-ফর্সের মাপ দেবার সময়েও অম্বিকাচরণের মনে হলো, তার মোজা ও সাস্‌পেণ্ডারের মাঝখানের অনাবৃত fairer অংশটির দিকে মেয়েটির চোরা চাহনি নিক্ষিপ্ত হলো।

বাইরে এসে অম্বিকাচরণ তার-পক্ষে-অসাধারণ ক্ষিপ্র-গতিতে পথ চলতে লাগলো। রমেন বোস তার পিঠ চাপড়ে বললে—একদিন খাইয়ে দিস্, কেমন ?

এর পর তিন দিন অম্বিকাচরণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হ্যাম্প্‌স্টেড্‌ হীথে র‍্যাম্ব্‌ল্‌ দিয়ে বেড়ালে, এবং বসন্তের ঈষদুষ্ণ দ্বিপ্রহরগুলি কাফি, স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ এবং Lawrence-এর কবিতার বই আর Sterne-এর ভ্রমণবৃত্তান্তের সাহচর্যে হুহু করে কেটে গেল।

অবশেষে তিনদিনের অপেক্ষিত শুক্রবারটি অরুণোদয়ের পূর্বেই অম্বিকাচরণের ঘরের পর্দা ঠেলে তার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ালো। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে সে সকাল আটটার অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট্‌ সেরে পিকাদিল্লীর এক শৌখীন নাপিতের দোকান থেকে তার আকুঞ্চিত কেশদামে একটা trimming-all-round লাগিয়ে এলো। Hector Pow-র বাড়ীর ভালো পোষাকটা রোদে দিয়ে ঝেড়ে মুছে, নাফ্‌তালিনের গন্ধ দূর করে, ট্রাউসারটা প্রেসে চড়িয়ে বিকেলের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করে রাখলে। সারাদিন বিশ্রাম করে কান্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সে আজ বাড়ীতেই লাঞ্চ্‌ করলে, এবং ঘণ্টাদুই দিবানিদ্রা দিয়ে নিলে। তার পর বিকেল হতে না হতেই চা না খেয়েই ধাওয়া করলে শেফার্ড্‌স্‌ বুশ্‌-এ।

রোজকার মত সেদিনও ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটি দোরের

কাছে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছিল। দূর থেকে অম্বিকাচরণকে দেখে বেশ একটু আড়ম্বর করে অভিবাদন জানালে, তার এবং তার বন্ধুর কুশল-প্রশ্নও বাদ গেল না।—হ্যাঁ-া্যা-া্যা, সু-উ-টু তৈরী, বেড়ে খুলেছে, মিস্-এর পছন্দ, ঠিক না হয়ে যায় না, কাপড়টা খুবই দামী, তবে মিস্ যখন পছন্দ করে দিয়েছেন তখন তার জন্যে অবশ্য এক্সট্রা কিছু নেবে না।

দোকানে ঢুকতেই লোকটি অম্বিকাচরণের হাতে বেশ বড় আকারের একটা পুলিন্দা গছিয়ে দিয়ে রসিদ লিখতে লাগলো।—না, না, ও আর ট্রাই করতে হবে না। Pucca finish, ভারতবর্ষে কী বলে "পাক্কা" না "পুক্কা"? হেঁ, হেঁ, তার এক মাসতুতো ভাই বোম্বাইয়ে আছে, প্রকাণ্ড ব্যবসা তার। আচ্ছা, লর্ড্ রেডিং সম্বন্ধে অম্বিকাচরণের ধারণা কী? সে হিন্দু না মুসলমান? আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের যে মারামারি হচ্ছে তাতে ভারতীয় মুসলমানদের মনের ভাবটা কী? ভারতবর্ষের পক্ষে British Commonwealth of Nations-এর অংশ হয়ে থাকাই অধিক মঙ্গলকর নয় কি?...

অম্বিকাচরণের চোখ-দুটো সমস্ত দোকানটাকে তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করে এতক্ষণ পরে বিশ্বাস করলে, সে সত্যিই আজ দোকানে নেই—মেয়েটি নেই।

তার সুদীর্ঘ সুখ-স্বপ্নের সূচনা ইহুদী বাক্-বহুলতায় তিক্ত হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, মেয়েটি হয়তো ইচ্ছে করেই আজ অনুপস্থিত হয়েছে। ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায়, হয়তো

সে চায় না। হয়তো এসব ইহুদী দোকানদারের কারসাজি, যাতে আর একটা স্যুট করাবার জন্যে আবার আসতে হয়। গত তিন দিন ধরে অম্বিকাচরণের মনে মেয়েটি যেন তার অনেক কাছে সরে এসেছে। তাই তার ওপর কেমন অভিমান হলো, ভারতীয় বলে হয়তো সে উপেক্ষিত হয়েছে। সেই বা কেন তার নিজের জাতীয় সম্ভ্রমকে হীন করবে ?

বাকী দাম চুকিয়ে দিয়ে অম্বিকাচরণ স্যুটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। পয়সা গুণে নিয়ে দোকানদার পেছন থেকে ধন্যবাদ এবং অভিবাদন জানালে। ঠিক সেই সময়ে রাস্তার ওপার থেকে মেয়েটিকে দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা পোষাকের গাঁটরীর ভারে নুয়ে পড়ে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তেমনি বিষাদ-ভরা তার ডাগর ডাগর চোখ, শীর্ণ, ক্লান্ত মুখ, জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা সে-মুখের ওপর এলো-মেলো রেখা টেনে দিয়েছে।

অম্বিকাচরণ আপন কর্তব্য স্থির করতে না পেরে হন্-হন্ করে এগিয়ে চললো। একটু দূরে গিয়ে সে পেছন ফিরে দেখলে, মেয়েটি তার বোঝা নিয়ে কোনো রকমে রাস্তা পার হচ্ছে।

ওয়েস্ট্-কোট পরা লোকটা তাকে সাহায্য করবার জন্যে এক পাও এগিয়ে গেল না। ভারবাহী মেয়েটির দিকে সেকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলো।

আকাশের গায়ে পাৎলা টুকরো-টুকরো মেঘগুলো যেন ধুহুরীর গায়ে তুলোর আঁশ। রাস্তার ওপারে পুরোনো জিনিষের দোকানটাকে দূর থেকে ফোগলা হাঁর মত দেখাচ্ছে। এক টিন Balkan Sobranie কেনা যাবে নাকি ?······

অম্বিকাচরণের বাস্ এসে পড়েছে।

কলিকাতা,
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

কান্না-গাছ

লন্দনে সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষাটা ঠিক যে-সময়ে হয়ে থাকে সে-সময়টা অন্ততঃ পড়াশুনো করবার উপযোগী নয়। তার মাস দুই আগেই "বারের" ছাত্ররা পরীক্ষা শেষ করে কন্টিনেণ্টে টহল দিতে বেরিয়ে পড়ে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো ও এর আগেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণদয়ালের সে-বার শেষ দান, তাই তার বন্ধুরা "চিরন্তন দিন" প্রত্যক্ষ করবার জন্যে স্পিট্‌স্-বের্গেন যাত্রা করলেও তাকে লন্দনেই থাকতে হলো। অবশিষ্ট পরিচিতদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করবার অভিপ্রায়ে সে তার গোল্ডার্স্ গ্রীনের বাসা তুলে দিয়ে ওয়াণ্ড্স্ ওয়ার্থে রুমস্ নিলে এবং সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় আপনাকে সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ প্রতিপন্ন করবার জন্যে অর্গলবদ্ধ অবস্থায় উঠে পড়ে লেগে গেল।

ওয়াণ্ড্‌স্‌ ওয়ার্থ্‌ ভারতীয় ছাত্রদের কাছে স্বল্প-পরিচিত হলেও সেখানেও যে উত্তর-লন্দনের হীথের মত প্রকাণ্ড একটি কমন্‌ বিদ্যমান, তা কৃষ্ণদয়ালের ঠিক জানা ছিল না। দু-এক দিন আকাঙ্ক্ষা দমন করে একদিন সে তার পুরানো অভ্যাস মত খানকয়েক বই নিয়ে লাঞ্চের পরে ওয়াণ্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ কমন্‌-এ গিয়ে হাজির হলো।

হ্যাম্পস্‌টেড্‌ অঞ্চলে যে-ব্যসনের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে এ-পাড়ায় বাসা তুলে নিয়ে এলো, এখানেও ঠিক সেই দুনিবার আকাঙ্ক্ষাটিই তাকে আগের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। এখানেও সে আবিষ্কার করলে নীচু, ভিজে ঘাস্‌-জমির ওপর উইলো গাছগুলো শিশুহারা প্রসূতির মত মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছে, একটু দূরে ফুলন্ত মে-গাছগুলোয় আগুন লেগেছে, এখানেও মর্মরিত পপ্‌লারের সারি ফান্‌ হহ্‌-এর ছবির মত আনন্দে মুখর।

জুনিপার গর্স্‌ আর বুনো স্ট্রবেরীর ঝোপে-ভরা খানিকটা মাঠ পার হয়ে কৃষ্ণদয়াল একটা উঁচু ঢিপির ওপর উঠে এলো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, মানুষের পায়ের চিহ্ন-রচা একটি সর্পিল পথ কুণ্ডলিবৃত্ত অজগরের মত মাঠের ওপর রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। লোকালয় আ-স্ফুট বিস্মৃতির মত দূরান্তরে অপসারিত। দুটো খুঁটির ওপরে তক্তা আঁটা বসবার জায়গাটার কাছে এসে কৃষ্ণদয়াল দেখলে তার মাথার ওপর ছোট একটি লিণ্ডেন ঝির্‌-ঝিরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। এই বোধ

হয় তার প্রথম ফুল ফোটানো, গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁপা রঙের ছোট ছোট গোটাকয়েক ফুল। তাদেরই গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভরপুর, আর সেই গন্ধে-ভরা নিস্তব্ধতার ভেতর শব্দের বুদ্বুদের মত কতকগুলো তামাটে রঙের বোলতা আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে চলেছে।

লিণ্ডেনের উষ্ণ গন্ধ আর বোলতার স্বগত গুঞ্জন দিবা-স্বপ্নের মত আবিষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিপ্রহরের এই মধুর অবসরটুকু উপভোগ করবার জন্যে কৃষ্ণদয়াল বইয়ের ব্যাগটার ওপর মাথা রেখে বেঞ্চীর ওপর শুয়ে পড়লো। গাছটার ঝির্‌-ঝিরে ছায়া তার মুখের ওপর কতকগুলো অদ্ভুত প্রকাশ-ভঙ্গিমার মত ক্ষণে ক্ষণে প্রলিপ্ত ও অপসৃত হতে লাগলো। আপন একাকিতায় সমাহিত এই লিণ্ডেন, অথচ কৃষ্ণদয়ালের মনে হলো সে যেন জন্মান্তরের স্মৃতির মত এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার সান্নিধ্যকে নিতান্ত সহজভাবে উপলব্ধি করছে। তার ছায়ায় যেন একটি গোপন স্পর্শ। উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের যে-বন্ধুতা তার কোনো দৈহিক প্রকাশ নেই, অন্তরের নীরন্ধ্র অধস্তলে যে-অনুভূতি উদ্বেল হয়ে ওঠে তার বাহ্যতা শুধু দৃষ্টি আর ছায়া। গোড়া থেকেই গাছটাকে কৃষ্ণদয়ালের কেমন ভালো লেগে গেছে। সে মনে মনে স্থির করলে, রোজ দুপুরে এখানে এসে পড়তে বসবে।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, তিনটে বাজে বোধ হয়, অথচ আজ সারা দুপুরে কৃষ্ণদয়ালের একটি পাতাও পড়া হয় নি। আজকের দিনটা থাক, নতুন জায়গা! সমস্ত লন্দন শহরটাতে একটু

একাকিতা উপভোগ করবার উপায় নেই, চারিদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ, পথে, টিউবে, বাসে মানুষের সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি, পার্কে, হীথে, সর্বত্র মানুষ, তার শ্বাস-প্রশ্বাসে উষ্ণ, ভারাক্রান্ত বায়ু, তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, তার অসহনীয়, আপত্তিকর উপস্থিতি। ওয়াণ্ড্‌স্ ওয়ার্থের এ-জায়গাটিতে এসে কৃষ্ণদয়াল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বিকেল পর্যন্ত বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে কৃষ্ণদয়াল Way-side Flowers বলে একখানা বই খুলে তার ছবি ও বিবরণগুলো অলসভাবে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো। মনে মনে সঙ্কল্প করলে, পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সে বইখানা নিয়ে ইংলণ্ডের গ্রামে গ্রামে এইসব নাম-না-জানা ফুলের সন্ধানে বেরুবে। সব-গুলোর অবশ্য দেখা পাওয়া যাবে না, কারণ জুন-মাসেই অনেক ফুল শেষ হয়ে যায়। তবে স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ আর ওয়েল্‌স্‌-এ অনেক রকমের ছোট ছোট বনফুল অগস্ট্‌ মাসেও টিকে থাকে। চেল্‌সীর ফ্লাওয়ার শো'তে সে যে কতকগুলো ঢ্যাপের থইয়ের মত ঘাসফুল দেখেছিল, সেগুলো নাকি লেক্ ডিস্‌ট্রিক্টে দেখা যায়, তাছাড়া খুব ছোট ছোট শাদা রঙের ফক্স্‌-গ্লাভ্‌ ওয়েল্‌স্‌-এর পাহাড়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। যাবার আগে mushroom সম্বন্ধেও একখানা বই কিনে নিতে হবে। ওয়েল্‌স্‌-এর পাহাড়ে নাকি নানান্ রঙের নানান্ রকমের পাতাল-ফোঁড় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদয়ালের হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়লো। পায়ে-

চলার পথটা দিয়ে একটি মেয়ে টিলাটার দিকে এগিয়ে আসছে, তার ব্রাউন রঙের স্কার্ট আর কমলা রঙের জাম্পার পড়ন্ত রোদে ঝলমল করছে। টিলাটার ওপর উঠে এসে মেয়েটি যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। কৃষ্ণদয়ালের মনে হলো, সে আর একজনের নিভৃত পলায়নের আশ্রয়টিতে অনধিকার-প্রবেশ করেছে। তাড়াতাড়ি বইয়ের ব্যাগটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—নিশ্চয়ই আমি আপনার রোজকার বসবার জায়গাটি দখল করেছি।

Not at all. বসুন না। আমি এখানে প্রায়ই আসি বটে, তবে বেঞ্চীটাতে অন্ততঃ দুজনের মত জায়গা আছে।

আমারও যাবার সময় হলো। আপনার আপত্তি না থাকলে অবশ্য আর একটু বসা যেতে পারে। আমার এ জায়গাটা ভারী ভালো লেগেছে, বিশেষতঃ এই লিণ্ডেন-গাছটাকে।

আশ্চর্য্য! এই লিণ্ডেনটা? আমারও ভারী ভালো লাগে একে। এই উঁচু জায়গাটার ওপর ও একেবারে একা। আপনি দেখছি বুনো ফুল ভালোবাসেন!

হ্যাঁ, ওটা আমার একটা ব্যসন বললেই হয়। এই দেখুন না, পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে এসে এই বইটা খুলে পড়ছিলাম।

আপনি ছাত্র? ভারতীয় নিশ্চয়।

হ্যাঁ। আপনি?

আমার বাড়ী আয়ারল্যাণ্ডে। কলেজে পড়া অবশ্য আমার ভাগ্যে হয়ে ওঠে নি।

কথায় কথায় মেয়েটির সঙ্গে কৃষ্ণদয়ালের পরিচয় হয়ে গেল, তার নাম শীলা, Sheila O' Henry. আয়ারলণ্ডের অর্দ্ধেক মেয়েদের নামই বোধ হয় শীলা, মেয়েটি হেসে বললে, মার্কিনী লেখক O' Henryর সঙ্গে অবশ্য তার কোনো আত্মীয়তা নেই, যদিও সবাই সে-কথা জিজ্ঞেস করে।

কৃষ্ণদয়ালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শীলা হেসে শুধালো—সাহস করে একজন অপরিচিত মেয়ের পাশে বসতেই পারলেন না এতক্ষণ? আপনি তো ভারী লাজুক!

এ আর এমন কি দুঃসাহসিক কাজ?—বলে কৃষ্ণদয়াল বেঞ্চীটার একধারে বসলো।—তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো একরকম পরিচই হয়ে গেছে।

শুনে সুখী হলাম। লণ্ডন আপনার লাগে কেমন?

কেন, বেশ ত।

একা একা মনে হয় না?

তা একটু হয় বৈকি।

একটু? আমার মনে হয় লন্দনের মত নির্জন শহর পৃথিবীতে নেই।

আমার কিন্তু একা থাকতেই ভালো লাগে।—কৃষ্ণদয়াল বললে।

তা জানি, আমায় আসতে দেখে আপনি যেভাবে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে যাচ্ছিলেন।

না আপনাকে দেখে পালাতে যাবো কেন? আমার আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি এই কাক-তাড়ুয়াটিকে দেখে হয়তো রীতিমত

ভয় পেয়ে যাবেন। তাছাড়া ভেবেছিলাম, হয়তো আর কারো সঙ্গে আপনার এ-জায়গাটিতে রান্দেভু আছে।

রান্দেভু! আপনার অনুমান মিথ্যা হয় নি। তবে সে রান্দেভুতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বাধার সৃষ্টি করতো না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমার রান্দেভু এই লিণ্ডেন-গাছটার সঙ্গে।—শীলা কৃষ্ণদয়ালের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসলে। তারপর নিজেই বইয়ের ব্যাগটাকে সরিয়ে দিয়ে বললে—ভালো হয়ে বসুন না, আপনার আধখানা যে ডালের ওপর পাখীর পুচ্ছের মত শূন্যে ঝুলছে!—উপমার জেরটা উহ্য রেখে শীলা আবার কৃষ্ণদয়ালের দিকে চেয়ে এবার সশব্দে হেসে উঠলো। বললে—ভাগ্যিস আপনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না! নাহলে দেখতে পেতেন, আপনার ওদিকটাকে দস্তুরমত পাখীর পুচ্ছ বলে ভুল করা চলে।

একটু লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণদয়াল এবার শীলার বেশ কাছাকাছি এসে বসতে বাধ্য হলো, কারণ বেঞ্চীটাতে সামনের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে গাত্রসংলগ্ন দুটি মানুষের বেশী বসবার জায়গা ছিল না। শীলা অনুমতি না নিয়েই বইয়ের ব্যাগটা একপাশে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলে, তারপর কৃষ্ণদয়ালের দিকে চপল দৃষ্টি হেনে শুধালো—আপনি কোনো অস্বস্তি বোধ করছেন না তো?

অস্বস্তি বোধ করবো কেন!

এমনি জিজ্ঞেস করলাম, করতেও তো পারেন! সবাই মেয়েমানুষের সংস্পর্শ পছন্দ না করতেও পারে, তাই আর কি।

আপনি পুরুষ হলে নিশ্চয়ই মীসোজেনিস্ট্ হতেন।—কৃষ্ণদয়াল একটা চলনসই গোছের রসিকতা করতে চেষ্টা করলে।

আশ্চর্য নেই।—শীলা সংক্ষেপে উত্তর দিলে, তারপর বললে—পুরুষমানুষ হলে অন্ততঃ স্ত্রীলোকের আস্বাদটুকু যে কী তা উপলব্ধি করতে পারতাম। পুরুষমানুষের লেখা কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ইত্যাদি পড়ে এক এক সময় আফ্‌শোষ হয় এই ভেবে যে, হয়তো আমরা একটা অতি নিবিড় সুখ থেকে একেবারে বঞ্চিত। মেয়েমানুষ বলেই আমরা স্বভাবতঃ মীসোজেনিস্ট, তাই নয় কী? আপনার হাতের আংটিটায় ওটা রুবী বুঝি? আপনি বিবাহিত নিশ্চয়।

নিশ্চয় মানে?

আপনার হাতে আংটি, তাই অনুমান করছি।

আমি একজন হতভাগ্য পুরুষ যার এখনো স্ত্রীলাভ ঘটে নি।

শীলা কৃষ্ণদয়ালের হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের কোলের ওপর রেখে আংটিটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। তারপর বললে—ভারী সুন্দর কাজ তো!

আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তো অনায়াসে ওটা খুলে নিতে পারেন।

না। আপনি যাকে ভালোবাসবেন তাকে দেবেন।

ভালো না বাসলে বুঝি দেওয়া যায় না?

হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু নেওয়া যায় না।—শীলা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলে।

তাহলে দেখছি আমার এই সসেজের মত আঙুলের সহবাসেই ওকে সারা জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

কেন, আপনি বুঝি কাউকে ভালোবাসেন না?—শীলা জিজ্ঞেস করলে।

ভালোবাসা জিনিষটা এক তরফা, তাই ভালোবাসতে আত্ম-সম্মানে বাধে। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই নি।—কৃষ্ণদয়ালের মনে হলো, সে একটা দস্তুরমত সারগর্ভ কথা বলেছে। শীলা কিন্তু তার কথায় হেসে উঠলো, বললে—জীবনে দেখা গেছে, আপনার মত বীরপুরুষরাই ও-আত্মসম্মানটুকু বলি দিয়েছেন সবার আগে। মেয়েমানুষের ভালোবাসাকে পুরুষের বন্ধুতার সমগোত্রীয় মনে করেন বলেই নানা মনগড়া অভিমান জমা করেন আপনারা। ওসব কিশোর বয়েসের সমৈন্দ্রিক প্রেম, ইস্কুলে-পড়া ছেলেতে ছেলেতে আর মেয়েতে মেয়েতে। তাই সে-বয়েসে একজনের মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া অপর জনের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু যেখানে মরদা ও মাদীর সম্পর্ক সেখানে প্রকৃতির ওসব মানসিক বিলাসের ধৈর্য দেখা যায় না।

আপনার সুদীর্ঘ গবেষণার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না।

বেশী পড়াশুনো করলে সহজ জিনিষ জটিল হয়ে যাওয়াই সম্ভব। আমার মনে হয়, ভালোবাসা মানে প্রকৃতির সৃজন-শক্তির তাড়নায় এক কর্তৃক অপরের অধিকার। অপর পক্ষের সম্মতি বা অনুমতি এর পরের ধাপ। সুতরাং আপনি ভালো-বাসলেই হলো। তাই বলছিলাম, আপনি আপনার এই

সুন্দর আংটিটি এমন মানুষকে দেবেন যাকে আপনি দেবার মত স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে নেওয়াতে পারবেন।

একটু চুপ করে থেকে শীলা হঠাৎ বললে—আমাদের দেশে গেলে আপনাকে যে-মুস্কিলে পড়তে হতো! আয়ারল্যাণ্ডের মেয়েগুলো ভারী বোকা হয়, জানেন, বিদেশী দেখলে তারা একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কী রকম?

কী রকম, এখনও বুঝতে পারলেন না? আপনি ভারী সরল মানুষ, এত দূরে দেশ ছেড়ে এলেন কী করে? যাই হোক, আয়ারল্যাণ্ডে যাবেন না যেন!

কেন?

কেন?—শীলা কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে চেয়ে বেশ একটু নিগূঢ়ভাবে হাসতে লাগলো।—কেন? তাও আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে?

না দিলে বুঝতে পারছি কৈ? জানেন, সব জিনিষ আমার মাথায় ঢোকে না, যেমন ধরুন বিজ্ঞান।

আপনি এখনো ছেলেমানুষ। বয়েস কত? বাইশ? তাই বলুন! চশমা পরে বিজ্ঞ সেজে বসে থাকলেই হয় না। আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনার বয়েস তিরিশ পঁয়-তিরিশের কম নয়! যেমন গম্ভীরভাবে বসে বসে পড়ছিলেন! বাইশ! হা-হা-হা!—শীলা দুষ্টামির হাসি হেসে উঠলো। তারপর কৃষ্ণদয়ালের চোখ থেকে শেলের চশমাটা খুলে নিয়ে নিজেই

তার বুক-পকেটে গুঁজে দিয়ে বললে—ওটা পরে লোককে ফাঁকি দেবার দরকার কী? দেখি, তাকান দেকি আমার দিকে। ও ভগবান, আপনার বয়েস বাইশও হয় নি যে, অথচ ঐ কাচ-দুখানাতে আপনাকে এমন বুড়ো দেখায়!

দেখালোই বা বুড়ো! জানেন, আমার আধ্যাত্মিক বয়েস অন্ততঃ শ'খানেক।

তা না হলে আর আপনি বুনো ফুলের ক্যাটালগ পড়ে সময় কাটান! আপনি যদি বলেন আপনি প্রজাপতি আর ডাকটিকিট জমান, আপনার বাড়ীতে একটি ছোটো-খাটো ভূতত্ত্বের যাদুঘর আছে, আপনি নিয়মিতরূপে Country Life পড়ে থাকেন, এবং আপনি বছর চল্লিশ ধরে পেন্সন ভোগ করছেন, তাহলে তার একটা কথাও আমি অবিশ্বাস করবো না।

আমাকে কি এতই বুড়ো দেখায়?

দেখায় বৈ কি ঐ কাচদুখানা চোখে দিলে।

আচ্ছা এইবার আমার পালা। আপনার বয়েস কত?

মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করা ভদ্রতা নয়, জানেন তো? তাছাড়া জিজ্ঞেস করলেও সঠিক উত্তর পাবেন না, তাও কি জানেন না?

তবুও বলুন না, আপনার বয়েস কত।

বলবো না। কেন? আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন নাকি?

যদি বলি হ্যাঁ?

তাহলে আপনাকে তার ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি। আইরিশ মেয়েদের আপনি চেনেন না।

কেন ?

তারা ডাইনী।

অর্থাৎ ?

তারা কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেদের চুষে খেয়ে ফেলে।

তাই নাকি ?

হুঁ, তাদের খপ্পরে পড়বেন না।

তবুও একবার পরখ করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

বেশতো আসবেন আজ, অন্ধকার হয়ে গেলে। এখন এগারোটার আগে অন্ধকারই তো হয় না। আসবেন এগারোটার সময় এই জায়গাটাতে।

বেশ। ঠিক তো ?

হ্যাঁ। অতবড় একটা রিস্ক্ নিতে আপনার ভয় করবে না ? পরে আমাকে দোষ দেবেন না কিন্তু।

না। ঠিক আসবো রাত এগারোটার সময়ে।

ঠিক ?

ঠিক। Honour bright.

কৃষ্ণময়াল বাড়ী ফিরে দেখলে চায়ের পাট অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে, প্যান্ট্রি থেকে ঠং-ঠং করে বাসন ধোয়ার আওয়াজ আসছে। বাড়ীর পেছন দিকের লনটার মাঝখানে একঝাড় রু, ছোট ছোট গাঁদা ফুলের কুঁড়ির মত ফুল, পাতায় ঝাঁঝালো,

সোঁদা গন্ধ। কৃষ্ণদয়াল তার কাছে বসে অন্যমনস্কভাবে তার রসালো পাতাগুলো ছিঁড়ে শুঁকতে লাগলো। বেস্‌মেণ্টে প্যান্ট্রির জানলা দিয়ে সোফীর কর্মরত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সলীল সঞ্চালন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। কুড়ি-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি নিবিষ্ট মনে চায়ের বাসন ধুচ্ছে, কাপগুলোকে রগড়ে রগড়ে ধোবার সময়ে তার কাঁধদুটো ওঠানামা করছে। কৃষ্ণদয়াল জানলা থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। ঐ সোফীই তো দিন দুই আগে তার বিছানার পাশে বেড-টী আর গরম জল রেখে যাবার সময়ে তার গালটা টিপে দিয়ে বলেছিলো, Get up, me choc'late-boy. বাড়ীর চাকরাণীদের এধরণের অসম্বৃত ব্যবহারকে সে সেদিন ভারতীয়দের প্রতি সাধারণ অবজ্ঞা বলেই মনে করেছিল। তানাহলে একজন ভদ্র বোর্ডারের গাল টিপতে যাবে কেন? কিন্তু এ-কদিন সে সোফীর ছোট ছোট কৃপার অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেও বুঝতে পেরেছে, সোফী যেন তার কাছ থেকে কী একটা দাবী করতে সুরু করেছে। কাল সন্ধ্যায় যখন কেউ বাড়ী ছিল না তখন সে লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে তার বইখানা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—D'ye unde'stand, me choc'late-boy? তারপর একটু থেমে তার দিকে চেয়ে বললে—Sai, yes. —কৃষ্ণদয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। আজ সকালে ব্রেকফাস্টে সে-ই পেয়েছিল সব চেয়ে বড় সসেজ-দুটো। খাবার সময়ে তার দস্তুরমত গা ঘিন-ঘিন করে উঠেছিল। সোফীর আচরণের কথা ভেবে সকালে তার মনে যে-পরিমাণে বিতৃষ্ণা

জন্মেছিল, এখন ঐধরণেরই কোনো একটা ছোটোখাটো আন্তরিকতার জন্যে তার মন ঠিক ততখানি প্রতীক্ষমান হয়ে উঠলো। সোফী যদি হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে রান্না-ঘরে নিয়ে গিয়ে তার জন্যে লুকিয়ে-রাখা বড় এক টুকরো প্লাম্-কেক্ দেয় একবাটি গরম চায়ের সঙ্গে তো সেও তার গালে একটা টোক্কা মারবে, মারবে বৈকি।

দোতলার জানলা থেকে ল্যাণ্ড্লেডীর মেয়ে ডরথীর গলা শোনা গেল—মিঃ মিটার রু-ঝাড়টাকে শেষ করে ফেললেন দেখছি! আজ যে শনিবার সে-কথা আপনার মনে আছে কী?

এতক্ষণ পরে কৃষ্ণদয়ালের স্মরণ হলো, কয়েকদিন আগে সে ল্যাণ্ড্লেডী ও তাঁর মেয়েকে সিনেমা দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কতকটা কথার ছলেই সিনেমার প্রসঙ্গ তুলেছিল, এবং ভেবেছিল ও-পক্ষ থেকে তার আর পুনরুক্তি হবে না। একটু ইতস্তত: করে বললে, খুব মনে আছে, মিস্ কিং, ছ'টার শো'তে যাওয়া যাক চলুন।—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের থার্মোমিটারটা একবার দেবেন?

থার্মোমিটার?

হ্যাঁ, মাথাটা একটু ধরেছে, তাই।

আপনি যেমন জানলার ধারে বসে রাত দুটো অবধি পড়েন! আসুন লাইব্রেরী-ঘরে, দেখি জ্বর হলো নাকি আবার।—ডরথীর স্বরে একটু যেন বেশী আন্তরিকতা প্রকাশ পেল। কৃষ্ণদয়াল প্যান্ট্রির জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলে, সোফী ইশারায় তাকে

যেতে বারণ করছে। সাবান-মাখা দু-খানা হাত নেড়ে যখন সে কোন প্রত্যুত্তরের সঙ্কেত পেলে না, তখন সে ডানহাতের আঙুলগুলো ঠোঁটে ঠেকিয়ে তার প্রেম-পাত্রের দিকে একটা চুমু ছুড়ে দিলে।

কৃষ্ণদয়াল এবার তার জীবনে এই প্রথম তার একটি চোখের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত করতে বাধ্য হলো। সোফী প্যান্ট্রিতে নিঃশব্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। ভরথী ওপর থেকে ডেকে বললে—কৈ, মিঃ মিটার দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

ভাবছি জ্বর মাপাটা ঠিক হবে কিনা। It'll be tempting the devil, you see. এমনিই তো শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, তার ওপর জ্বর মাপলে নিজেকে আস্কারা দেওয়া হবে না কী?

Not in the least. আপনি শুয়ে পড়ুন, মিঃ মিটার। আসছে হপ্তায় সিনেমায় যাওয়া যাবে, কেমন? আমি অ্যাস্পিরিণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সোফী! সোফী—

এর কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণদয়াল মিসেস ও মিস্ কিঙের হাঁক-ডাকে শয্যাশায়িত হলো, এবং অধোবদন সোফী এক গেলাস লেবুর রস ও দুটো অ্যাস্পিরিণের বড়ী দিয়ে যাবার সময়ে তার গালে একটা টোক্কা মেরে গেল।

কৃষ্ণদয়াল নিজের মধ্যে কেমন এক গোপন শিহরণ অনুভব করলে, কিসের এক বহিঃপ্রকাশের আকুতি, যেমন সে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কখনো কখনো উপলব্ধি করেছে। বাইশ বছরের জীবনী-শক্তি যখন অপর একটি বাইশ বছরের জীবনী-শক্তিকে

স্পর্শ করে তখন তনুতে তনুতে যে অগ্নি-অণু ফুলকি দিয়ে ওঠে তার নাম কামনা। কৃষ্ণদয়ালের শিরায় শিরায় কামনার আগুন জ্বললো। উষ্ণ, ওজস্মান আল্‌কহলের মত তা তার চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও স্নায়ুমণ্ডলীকে উন্মুখ করে তুললে। কৃষ্ণদয়াল অপর একটি সত্তাকে নিতান্ত সন্নিধরূপে পেতে চাইলে।

সোফী ততক্ষণ বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। পাশের সিঁড়ি দিয়ে ভরথীর জুতোর শব্দ লাফ দিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল, ছ'টার শো'র আর বেশী দেরী নেই। বাড়ীতে মিসেস্ কিঙের নৈতিক পুলিশীর প্রসাদে সোফী যদিও বা আবার তার ঘরে আসে তো সে রাত দশটার আগে নয়, এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে, তাও মিনিট খানেকের জন্যে।

রাত দশটা, তখনই তো তাকে কোনো একটা ছুতো করে বেরতে হবে ওয়াণ্ড্‌স্‌ওয়ার্থ কমনে, সেই লিণ্ডেন-গাছটার তলায়। চারিদিকে অন্ধকার তন্দ্রার মত নিবিড় হয়ে উঠেছে, একটু পরেই একটি ঋজু, সাবলীল ছায়ামূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালো। শীলাই তো! ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না। আমিও তাই। তবে এলেন কেন? আর আপনি? তার পরই two hearts beating each to each.

কৃষ্ণদয়ালের কল্পনা থমকে দাঁড়ালো। এর পরের দৃশ্যটা রীতিমত দীর্ঘ হওয়া চাই। শীলার সবটুকু কেমন যেন মনে পড়ে না। কৃষ্ণদয়ালের চেয়ে বয়েসে সে বেশ একটু বড় হবে বৈকি। কিন্তু শীলার পরিপূর্ণ যৌবনের ভেতর যে একটি নিভৃত

আশ্রয় আছে, তার স্নিগ্ধ আকর্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ঐ আবছা ছায়ামূর্তির যেটুকু মনে না পড়ে সেটুকু কল্পনায় ভরে নিতে হয়। শীলার আবিষ্ট চোখ-দুটিকে কৃষ্ণদয়াল চুমায় চুমায় বুজিয়ে দিলে। চিন্তায় আবার কিছুক্ষণের জন্যে ছেদ পড়লো। শীলার মুখখানি একটু উপর দিকে তোলা, "মায়া" প্রতিমূর্তি-গুলোর মত। ওষধি যেমন বর্ষার জল আর চাঁদের আলো উন্মুখ হয়ে পান করে, শীলা যেন ঠিক তেমনি করে কৃষ্ণদয়ালের আদর উপভোগ করছে। ছবিটা এতক্ষণ পরে ধরা দিলে। হ্যাঁ, শীলা ঘাসের ওপর বসে তার দেহটাকে একটু এলিয়ে দিয়ে মুখখানিকে ওপর দিকে তুলে ধরেছে। তাই নয় কী? তারপর সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো। কৃষ্ণদয়াল তার ভরন্ত বুকের ওপর মাথা রাখলে।

টক্-টক্ করে দরজায় ঘা দিয়ে সোফী ঘরে ঢুকলো। তার মুখের ওপর একখানা চিঠি ছুড়ে দিয়ে বললে—'Ere ye are, me choc'late boy, some'un's written yah a luv-letter. বাড়ীর চিঠি। আজ শনিবার। এর মধ্যেই নটা বেজে গেছে! পিওনের নকারের শব্দও পায় নি সে। যাবার সময়ে সোফী এবার সত্যিই তাকে একটা চুমো দিয়ে গেল। তার ঠোঁটের ওপর কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ লেগে রইলো অনেকক্ষণ ধরে। বাড়ীর চিঠিখানা আজ না খুললে কেমন হয়? জানলা দিয়ে দক্ষিণে হাওয়ার মত খানিকটা বাতাস গায়ে লাগলো, মন-কেমন-করা, উদাসী বাতাস। কৃষ্ণদয়াল খাম খুলে বাড়ীর

চিঠি পড়তে বসলো। একখানা খামে খানচারেক চিঠি, বাবা, মা, তার ছোট ভাই পিনাকী আর বোন বল্লরী লিখেছে। সেই একঘেয়ে কথা, দু-বছর দেশ ছেড়েছে, আর কতদিন সে বিলেতে বসে থাকবে? আই-সি-এস্ পরীক্ষা যেন খুব ভালো হয়; চাকরী না হলে ধার-করা টাকা শোধ হবে কী করে? বিলেতে আসা পর্যন্ত খরচ হয়েছে পাঁচ-হাজার, তার সবটাই যে ধার-করা! পাওনাদররা এর মধ্যেই তাগাদা স্বরু করেছে। চারখানা চিঠিতেই সেই একই কথা। বল্লরী নিতান্ত ফরোয়ার্ড মেয়ে, চিঠিতে পণ-প্রথার কথা তুলে তার নিজের বিয়ের দায়িত্বের উল্লেখ করেছে। লিখেছে, এতে আমার মত একেবারেই নেই। কিন্তু আমার কথা ভেবে মার শরীর একবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তাই ভাবছি, আর জিদ করা উচিৎ নয়, অন্ততঃ তাঁর শরীরের দিকে চেয়ে। তুমি আই-সি-এস্ হলে আমাদের কী ফুর্তিটাই হবে দাদা, সত্যি! পিনাকী লিখেছে, তাকে টুইশানী করে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হচ্ছে, দাদা আই-সি-এস্ হয়ে এলে সে বিলেতে যেতে পারবে।

সব চিঠিগুলো পড়বার কৃষ্ণদয়ালের ধৈর্য থাকে না। পরীক্ষার আর মাত্র পনেরো দিন বাকী। এবারও অকৃতকার্য হলে সে বাড়ীতে লিখবে কী? দশটা বাজলো। শীলার সঙ্গে দেখা হবার আরো একঘণ্টা দেরী। এখন থেকে পোষাক পরতে স্বরু না করলে সাড়ে দশটার আগে বেরনো যাবে না। লিণ্ডেন-গাছটার কাছে পৌছতে পৌনে-এগারোটা বেজে যাবে। শীলার আগেই

সেখানে পৌঁছতে হবে। কৃষ্ণদয়াল বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিলে। কিন্তু তার ভেতরটা অমন কাঁপছে কেন? দু-বছর আগে সে তার মার পা ছুঁয়ে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল, সে কথাটা কি এখন মনে না পড়লেই নয়? ধার-করা টাকা, সংসারের দায়িত্ব, মায়ের অসুস্থতা, নৈতিকতার বন্ধন। কৃষ্ণদয়াল ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারী করে আইনের বই খুলে বসলো—Compendium of Common Law. মনোগ্রাহী বিষয়। কয়েক পাতা অতিক্রম করার পর সে আস্তে আস্তে নিজেকে প্রকৃতিস্থ বোধ করতে লাগলো। Crime আর Tort-এর ফারাকটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। Kenny-র চেয়ে এই বইটাতে বেশ পরিষ্কার ব্যাখ্যা। এইটা পড়লেই চলবে, ছোটর মধ্যে। Kenny, Pollock পড়বার সময় কৈ? আচ্ছা যাক্, Trespass-এর কেস্‌গুলো একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক্। হলের বড় গ্র্যাণ্ড্‌পা ঘড়ীটাতে ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে গেল। কৃষ্ণদয়াল হঠাৎ বই বন্ধ করে নীচে নেমে গেল। ঐ যে তার টুপীটা হ্যাট্-স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে। ড্রইং-রুমে ভরথী তার মাকে সিনেমার গল্প বলছে।—মিঃ মিটার নাকি! আপনি যে বড় নীচে নেমে এসেছেন!—ভরথীর সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবে কৃষ্ণদয়াল বললে—Going to have a breath of fresh air, Miss king.

দাঁড়ান না, I can accompany you, if you will—ভরথী হলে বেরিয়ে আসে।

তার আগেই কৃষ্ণদয়াল বাইরে থেকে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেকখানি পথ, টিলাটার ওপর পৌঁছতে আধঘণ্টা লেগে যাবে। তার ওপর চড়াই-ওৎরাই, পথটাও ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। মাঠের ওপর অন্ধকার থম্‌থম্‌ করছে। জায়গায় জায়গায় অর্দ্ধশায়িত নর-নারীর অস্ফুট ছায়ামূর্তি, চুপি-চুপি কথা। দরিদ্র পল্লীর ভাগের কম্‌সে সঙ্কোচ হয় বৈ কি, তাই প্রকৃতির এই উন্মুক্ত ক্রোড়টুকুর জন্যে এদের অন্ধকারের অপেক্ষা করতে হয়। কৃষ্ণদয়াল হন্‌-হন্‌ করে এগিয়ে চলে। এইবার পথটা চেনা যাচ্ছে। ঐ যে লিণ্ডেন-গাছটা আগের মতই আপন একাকিতায় সমাহিত। কৃষ্ণদয়াল টিলাটার ওপর উঠে এলো। না—এদিক দিয়ে নয়, একটু ঘুরে সে ওদিক থেকে শীলার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। শুকনো পাতার ওপর চলার শব্দকে দমন করা যায় না। শীলা হয়তো তার দিকে ফিরে হেসে উঠবে। শীলাইতো, ঘাসের ওপর ঐতো আবছা হলদে রঙের তার জাম্পার! সন্তর্পণে পা টিপে টিপে কৃষ্ণদয়াল এগিয়ে যায়। কিন্তু কৈ শীলা! ঘাসের ওপর একখানা পুরোনো ছেঁড়া খবরের কাগজ হাওয়ায় অল্প অল্প নড়ছে। শীলা নেই। কৃষ্ণদয়াল সমস্ত টিলাটা প্রদক্ষিন করেও তাকে দেখতে পেলে না। ডাকলে, শীলা, শীলা, হ্যালো, where are you? উত্তর নেই। হয়তো শীলা এসেছিল, তার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ী ফিরে গেছে। কৃষ্ণদয়াল লিণ্ডেন-গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো। ঠিক তারই মত হয়তো

শীলা এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, তারপর অভিমান করে চলে গেছে।

কৃষ্ণদয়াল গাছটাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। তার বুকের ভেতর বহিঃপ্রকাশের এক বিষাদ-ভরা আকুতি গুমরে গুমরে উঠছে। পথ, কোথায় পথ? অন্তর্নির্বাসী সৃষ্টির বেদনা একাকিত্বার পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরে।

লিণ্ডেন-গাছটা কাঁদে বুঝি। সে কী কান্না!

কলিকাতা,

ফাল্গুন, ১৩৪৮

৫

ফগ

প্রতিটি হৃদয়ের জন্যে এক-একটি পৃথক্ কুঞ্চিকা মজুত থাকে কি না, তা নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ আছে, কিন্তু একটি চাবির সংস্পর্শে যে একাধিক তালা বা কল নিতান্ত সহজে আত্মোন্মচন করে, তার পরিচয় পাওয়া গেল লন্দনে নভেম্বর মাসের ফগ-প্লাবিত একটি মধ্যরাত্রে।

আসলে ব্যাপারটাকে একটি নিবিড় "আকাঙ্ক্ষা-পূর্তির" জীবন্ত উদাহরণ বলা চলে। অর্থাৎ বনবিহারী প্রতি রাত্রে আইডার-ডাউনের ওমে বালিশে মুখ গুঁজে যে-ধরণের একটি চিত্রের কল্পনা করে থাকে, সেদিনকার ঘটনাটা ঠিক সেই ধরণের। কল্পনার বিষয়বস্তু যে একটি নায়িকা এবং তাঁরই লীলাস্থল, একটি অদৃষ্ট- ও অজ্ঞাতপূর্ব বেড্-সিটিং রুম, তা বলাই বাহুল্য। বনবিহারী কলেজে বেরবার আগে তার বইপত্তর নিয়ে যখন

ঘরের মাঝখানের গজদুই খালি জায়গাটায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে, ঠিক সেই সময়েই দেখা যায়, পাকা চেরী রঙের পোষাক-পরা সঞ্চারিণী লতেব একটি তনু স্ট্রীম-লাইন গতিতে জানলার ফ্রেমটুকু অতিক্রম করে চলে গেল। বনবিহারী দোর খুলে বাইরে এসে তার পশ্চাদ্ধাবন করবার আগেই সে তার নাকের সামনে একখানা দোতালা বাসে উঠে পড়ে যেন ট্যাঙ্গোর তালে তালে দেহ দুলিয়ে ওপরের সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠতে থাকে। বনবিহারীর প্রবাস-জীবনে এই ধরণের বাস ফেল করা নিত্যই ঘটে থাকে। তাই শীতের সন্ধ্যায় লেপ মুড়ী দিয়ে তাকে প্রায়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিছানায় শুয়ে সে তার মনোরথে সওয়ার হয়ে সটান গিয়ে হাজির হয় একেবারে তার প্রতিবেশিনীর বেড্-সিটিং রুমে, যখন মেয়েটি নাইট্-গাউন পরে তার চেস্ট্নাট রঙের চুলগুলো থেকে হেয়ার-পিন্‌টি খুলে দাঁতে চেপে ধরে হাতে-মুখে ক্রীম মাখছে। প্রতিদিনই শুতে যাবার আগে এই চিত্রটিকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করবার জন্যে বনবিহারীর মন সারাটি সন্ধ্যা উন্মুখ হয়ে থাকে। মেয়েটি বহুক্ষণ ধরে হাতে-মুখে ক্রীম মাখে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে ল্যাভেণ্ডার-জল সিঞ্চন করে, মোজা খোলে এক পাটি এক পাটি করে, তারপর আলোটা নিবিয়ে দেয় একটু যেন উত্তেজিতভাবে। এর পরেই বনবিহারীর পরীক্ষাপাঠক্লিষ্ট দেহ-মন ঘুমের কাক-চক্ষু জলের একেবারে তলায় নেমে যায়।

সেদিনকার ঘটনাটা এই চিত্রটিরই মোটামুটি একটি tableau vivant. অর্থাৎ সন্ধ্যায় বার-ডিনার ও সিনেমা সেরে বনবিহারী যখন রাত বারোটার সময়ে Russel Sq. স্টেসনে টিউব থেকে রাস্তায় উঠে এলো তখন সমস্ত লন্ডন শহরটার চিহ্নমাত্র নেই। বিশ্বসৃষ্টির আদিযুগে যে বাষ্পীয় পদার্থ লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে শূন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াতো, লন্ডন শহরটা ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে গেছে। বনবিহারীর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ-চলা অভ্যাস ছিল বলেই সে তরল গোলাবী রেউড়ীর মত গাঢ়, চট্‌চটে ফগের ভেতর দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কোনোরকমে নিজের বাড়ীর সুমুখে এসে হাজির হলো। হ্যাঁ, এইটেই তো Burton St., ফগের ভেতর থেকে যেন একটু আলো দেখা যাচ্ছে, তাহলে এইটেই তার বাড়ীর সামনের ল্যাম্প্-পোস্ট্। পকেট থেকে ল্যাচ্-কী বের করে দরজার ছিদ্রে প্রবেশ করাতেই যেন চিচিং-ফাঁকের মত যাদুবাক্যের প্রভাবে অনায়াসে সেটি হাট হয়ে খুলে গেল।

বাড়ীতে ঢুকেই ডানদিকে পথের ওপর তার ঘর। অন্ধকারে দেওয়ালের গায়ে একটু হাত বুলোতেই তার ঘরের দরজার নবটা একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরা দিলে, এবং মৃদু সম্মতির মত অস্ফুট শব্দ করে দরজাটাও একপাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর বাঁ-দিকের কোণে সুইচ। বনবিহারীর মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো। শক্ লেগে নয়। দপ্ করে আলোটা জলে উঠতেই সে দেখ্লে তার ঘরখানা একেবারে আগা-পাশতলা বদলে গেছে, তার

বইয়ের আলমারীর জায়গায় চমৎকার একটি প্রসাধন-মুকুর, আগুনের ধারের তার অত আরামের সোফাটার জায়গায় একটা রঙীন ঘেরাটোপ-ঢাকা সেটী, তার ওপর তুলতুলে, চুপচুপে গোটাকয়েক কুশন, ঘরের একপাশে একটা তিনপায়া টেবিলের ওপর রোমান নাভারো ধাঁজের কয়েকজন পুরুষের ফটো, এবং জানলার কাছে ঝলমলে ঝালর-দেওয়া পর্দাটার নীচে ছোট্ট বাহারে খাটখানার ওপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন তারই প্রতিবেশিনী, সেই স্ট্রীম-লাইন-গতি-চঞ্চলা, চেস্ট্-নাট-চিকুর-শোভিনী ছলনাময়ী!

বনবিহারী এতদিন ধরে যে অসম্ভব সম্ভাব্যের কথা আপন কল্পনায় ফেনিয়ে ফেনিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে এসেছে, তার ঐ মরচেপড়া কুঞ্চিকাটির প্রসাদে তা-ই আজ এমন অকস্মাৎ অতর্কিতরূপে বাস্তব হয়ে উঠলো। এবং বনবিহারী তার স্নায়ুমণ্ডলীর আঁতে-কোণে যেখানে যতটুকু সাহস আছে, সবটুকু একত্র করে মেয়েটির জেগে-উঠার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। রূপ-কথার নিদ্রিত রাজকন্যা এবং সোণার কাঠি, রূপোর কাঠি প্রভৃতির উপমা-বহুল কাব্য-ভাবও যে তার ভাবপ্রবণ মনে উদিত হলো না, এমন নয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার তিতিক্ষার বিচ্যুতি ঘটলো। এবং উক্ত রাজকন্যাকে সোণার কাঠি বা অন্য কোনো উপায়ে জাগরিত করবার উদ্দেশ্যে সে পালঙ্ক-অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

আমাদের এই Prince Charming-টি যখন আস্তে আস্তে তার Sleeping Beauty-র ওপর ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তার পা লেগে খাটের তলায়-রাখা এক গেলাস জল উল্টে পড়ে ঘরখানা ভাসিয়ে দিলে। সেটা তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়ে তার নজরে পড়লো গেলাসের ভেতর দু-সারি দাঁত তার দিকে নিজেদের মেলে ধরে নিঃশব্দ অট্টহাস্যে তার প্রেম-বাসনার প্রতি কুৎসিত কটাক্ষ করছে।

বনবিহারী আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। চাবিটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘন বালির মত ফগের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে লন্ডনের পথে পথে সারা রাত নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো।

কলিকাতা,
২২শে আষাঢ়, ১৩৪৯